বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 645. May, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪৫ সংখ্যা। | বৈশাখ, ১৩২৪। মে, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

নববর্ষ।

অতিথি আজিকে দুয়ারে এসেছি,
খোলো ওগো খোলো দ্বার;
গিয়াছে যে চলে, তাহার লাগিয়া
ফেলিও না আঁখি-ধার।
আন গো বরণ-ডালা,
মুছে আঁখি,—দাও নবাগত-গলে
নবফুলে গাঁথা মালা।

সব বাধা ফেলে, এস ওগো চলে,
কি হবে চাহিয়া পিছে?
যে গেল, তাহারে যেতে দাও সুখে;
কেন তারে স্মর মিছে?
কত লাভ, কত ক্ষতি,—
কি হবে খতায়ে? শেষ কর শুধু
মৌনে সন্ধ্যারতি।

আমারি আজিকে এই রাজাসন,
আমারি এ অধিকার,
হাত ধরে মোরে বসাও আসনে,
পিছনে চেয়ো না আর।
কাল ছিল তারি সব;
বিশ্ব-বিধিতে আজ মোরি তরে,
ঘরে ঘরে কলরব!

পূর্ণ কলস শোভিতেছে,
দোলে আম্রপত্র-মালা,
মঙ্গল গান গাহিতেছে, দেখ,
ঘরে ঘরে কুল-বালা!
রুদ্ধ শুধু এই দ্বার;
রাজা হ'য়ে তবু যাচকের বেশে
যাচি নিজ অধিকার!

ফুরাবে যে-দিন আমার,
সে-দিন চলিয়া যাব গো ধীরে,
কে চাহে, কেই বা নাহি চাহে,
তাহা দেখিতে চা'ব না ফিরে।
আজ নহে অবহেলা ;—
আশার তরুণ দুয়ার খুলিয়া
খেলিতে এসেছি খেলা !
নিজ-হাতে গড়া ওই মালাখানি
দাও রাণি, গলে মোর,
বক্ষ ধরিয়া বহিয়া বেড়া'ব
ওই তব ফুল-ডোর।
চলে যাব তার পরে,
তোমার স্মৃতির শুভ্র কুসুম শূন্য হৃদয়ে ধ'রে।
পিপাসী তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
দান কর তারে মধু ;
হাত ধরে আজ তোমারি পাশেতে
লও মোরে লও বধূ !
ভরে দাও আজি প্রাণ ;
চির-জীবনের সম্বল যাচে,
দাও ভিখারীরে দান।

শ্রীলতিকা দেবী।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

অবতরণিকা।

কর্ম্মবহুল কোলাহলপূর্ণ সংসারের কঠোর আবহা হইতে দেহ-মনকে একটু অবসর দিবার মানসে শারদীয় অবকাশে পুণ্যতীর্থ-দর্শনাভিলাষী হইয়াছিলাম। ভ্রমণে এত আনন্দ, এত অনাবিল তৃপ্তি, পূর্ব্বে একবার কল্পনায়ও আসে নাই! ব্যাধি-জর্জ্জরিত দুর্ব্বলদেহে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়াছিলাম, বিষাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাবিতে ভাবিতে আত্মশক্তির প্রতি একটা অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। নিতান্ত কাপুরুষের মত কর্ত্তব্যরাশি হইতে বহু-দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম। অকস্মাৎ এক অজ্ঞাত শক্তি পরোক্ষে আমার এই ভগ্ন-মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। অত্যল্প-কাল-মধ্যেই হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ভ্রমণে কেন্দ্রীভূত হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কলিকাতা-মহানগরীর কোনও এক ছাত্রাবাসে উপনীত হইলাম। প্রথমে প্রবাসী বন্ধুবর্গের সরল উদার ব্যবহারে ভারাক্রান্ত মন মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া উঠিল। তাহার পর মহানগরীর বিচিত্র কোলাহল, অহোরাত্র-ব্যাপী বিপুল জনস্রোত, ফেরিওয়ালাগণের বিকট চীৎকার, মুহুর্মুহুঃ ট্রামগাড়ীর ঘণ্টাধ্বনি, হাওগাড়ীর অদ্ভুত গতিবিধি, গগনস্পর্শী রম্য হর্ম্ম্যনিচয় ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে করিতে কোন্ সুদূর অতীতে নীত হইলাম! স্বর্ণময় ছাত্রজীবনের পুণ্যস্মৃতি প্রাণে জাগিয়া উঠিল!

এমন একদিন ছিল, প্রাণে অদম্য আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ এবং সাহস লইয়া কর্ত্তব্য-

সাধনে প্রবৃত্ত হইতাম ; সহায়-সঙ্গীর অভাব ঘটিত না। চতুর্দ্দিকে উল্লাস, হাসির তরঙ্গ! সকলেই উদার, সরল,—সকলেরই জীবনের লক্ষ্য এক ; পরস্পর প্রীতিপাশে বদ্ধ সকলেই উচ্চভাবে প্রীতি-পুলকিত। দৈনন্দিন জীবন বিধিবদ্ধ কর্ত্তব্য-রাশি পালনে পর্য্যবসিত হইত। অতীতের এই পুণ্যময় প্রভাব বিস্মৃতির অতল জলে নিমগ্ন হইয়াছিল। বিধাতার কি বিচিত্র বিধান! ছাত্রজীবনের সীমান্তে দণ্ডায়মান হইয়া সংসারের এক উজ্জ্বল, মহিমমণ্ডিত, লোভনীয় প্রতিকৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। স্বাতন্ত্র্য, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভোগবিলাসিতা, অর্থাগম, সাধারণ্যে ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি, প্রত্যেকে আমায় প্রলুব্ধ করিতে লাগিল, আর আমি পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিলাম ;—মরীচিকার প্রতি ধাবিত হইলাম। কিয়দ্দূর চলিয়া দেখি, প্রত্যাবর্ত্তন সম্পূর্ণ অসম্ভব। অভিনব এই রাজ্য!—এস্থানে বাসনার তৃপ্তি নাই, কর্ম্মের অবসান নাই ;—ভাবনারাশি নিতান্ত অসংযত; প্রতিকূল ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে জীবন ছিন্ন-ভিন্ন ; ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—সব অস্পষ্ট! নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই—দারুণ পিপাসা—দারুণ অতৃপ্তি! ইচ্ছাশক্তি কিয়দ্দূর চলিয়াই পতিত হয়। আবার সব শিথিল। এ-রাজ্যে প্রদর্শক নাই,—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে যে-দিকে চলিবে, সে-দিকেই অজ্ঞেয় অনন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিঘ্ন আছে, কিন্তু লঙ্ঘন করিতে মন সরে না। কোথা হইতে আবিলতা আসিয়া দেহ-মনকে তন্দ্রাবিজড়িত করিয়া রাখে। চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা—সব যেন কুয়াসা-সমাচ্ছন্ন! অনুভূতি আছে—কখনও তীব্র, কখনও মধুর! পদার্থ আছে, কিন্তু সব বিকৃত,—কাহারও সহিত কাহারও সংসক্তি নাই। খুঁজিতে খুঁজিতে এই বিশাল বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে একটু শৃঙ্খলা, একটু মধুরতার ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়, তাহা ক্ষণিক,—নিমেষ-মধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া যায়! দয়াময়, আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অক্ষম, দুর্ব্বল! এই বিচিত্র প্রহেলিকা আমার দুর্ব্বোধ্য!' এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম।

হাবড়া ষ্টেশন।

এতাদৃশ ভাবনারাশি লইয়া মহানগরীতে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ইচ্ছা হইল না। অভিনব দৃশ্যাদি আমায় আকৃষ্ট করিতে পারিল না ;—সব শূন্যময় প্রত্যক্ষ করিলাম! অগত্যা ২রা অক্টোবর দুর্গানাম স্মরণ করিয়া ছাত্রাবাস হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। অগতির গতি হাবড়া-ষ্টেসন রেল-পথে যাতায়াতে ভারতের কেন্দ্রস্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দীপালোক-পরিশোভিত সুবৃহৎ ষ্টেসন-গৃহ প্রতিক্ষণে যাত্রিবৃন্দকে সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছিল। প্রবেশ-দ্বার অতিক্রম করিয়াই উজ্জ্বল আলোকে নয়ন ঝলসিয়া গেল। তাহার পর অবিরাম পদ-সঞ্চার-শব্দ ও গতিশীল জনসঙ্ঘ! বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের স্থানে-স্থানে টিকিট বিক্রয়ের 'কেবিন' ; ক্ষুদ্র গবাক্ষ-দ্বারে টিকিট-ক্রয়ার্থী মূল্য স্থাপন করিতেছে, আর থাকিয়া থাকিয়া শ্বেতাঙ্গীগণের স্বুবর্ণ-কঙ্কণ-পরিশোভিত ক্ষিপ্রহস্তের পুরোভাগ পরিদৃষ্ট হইতেছে। তথায় গোলযোগ নাই—বাদানুবাদ নাই।

সকলেই আলোকের সাহায্যে স্ব স্ব টিকিট পরীক্ষা করিয়া লইতেছে। যিনি নিরক্ষর, তিনি অপরের সাহায্যে তৃপ্ত হইতেছেন। তাহার-পর সকলেই দ্রব্যজাত- ও সঙ্গি-সমভিব্যাহারে 'প্ল্যাটফরমে'র দিকে ধাবিত হইতেছে।—সহযাত্রিগণকে অনুনয়-বিনয় করিতেছেন; কেহ বা ক্রোড়স্থিত রোরুদ্যমান শিশুকে ক্রীড়া-পুত্তলিকা ক্রয় করিয়া দিতেছেন। কেহ পয়সা লইয়া কুলীর সহিত বাদানুবাদ করিতেছে; কেহ বা প্ল্যাটফরমের একটী বেঞ্চে বসিয়া
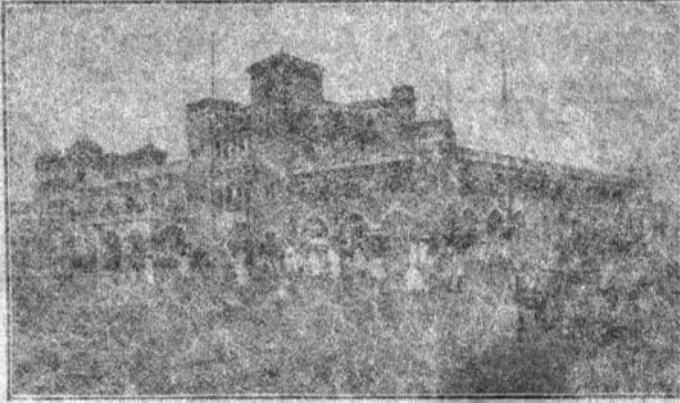
হাবড়া ষ্টেশন।

প্রবেশ-পথে নিরীহ-নির্য্যাতনকারী অজাতশ্মশ্রু সাক্ষাৎ যমদূত! দর্পভরে, রূঢ় ব্যবহারে তিনি উৎকণ্ঠা ও ভীতির মাত্রা বাড়াইয়া দিতেছেন। তাহারপর লৌহ-বেষ্টনী-সুরক্ষিত প্ল্যাটফরমের অভ্যন্তরে তাড়াহুড়া ও ছুটাছুটী! গাড়ী ছাড়িবার বেশী দেরী নাই—এই ভাবিয়া, সময়ের সঙ্কীর্ণতা অনুভব করিয়া, কেহ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে; কেহ বা কক্ষে প্রবেশ-কালে অভ্যন্তরস্থ আরোহিগণের বিদ্রূপাত্মক আমন্ত্রণে আপ্যায়িত হইতেছে; কেহ অবগুণ্ঠিতা সঙ্গিনীদিগের ধীর-মন্থর পাদ-বিক্ষেপে উত্যক্ত হইয়া বিকৃত মুখভঙ্গী করিতেছে, এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই অপেক্ষা করিতেছেন;—এ-দিকে ভারবাহী দ্রব্যজাত লইয়া দ্রুতগতিতে বহুদূর চলিয়া গেল। কোনও বৃদ্ধ একটু বসিবার স্থানের জন্য সদ্যঃক্রীত "এমপায়ার"-নামক সান্ধ্য সংবাদ-পত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন ও হস্তে একখণ্ড অর্দ্ধদগ্ধ চুরুট থাকিয়া থাকিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে পঞ্জাব-মেলে স্থানাভাব ঘটিল। যাত্রাকালীন বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া পঞ্জাব-মেল চলিল; কত সুখ-দুঃখ, আশা-উৎকণ্ঠা বহন করিয়া লইয়া গেল। কত সঞ্চিত ভাবনারাশি, কত মধুর আবেগ দূর-দূরান্তে ছুটিল!

বারাণসীর পথে।

বারাণসীর একখানি টিকিট ক্রয় করিয়া তাড়াতাড়ি বোম্বে-মেলে বসিয়া পড়িলাম। আমাদের কামরায় দুইজন বাঙ্গালী।—এক-জন দার্শনিক ও মিতভাষী; তিনি উপবিষ্টস্থিত বেঞ্চে বসিয়া, বোধ হয়, দার্শনিক তত্ত্বে মনো-

নিবেশ করিলেন; অপর ভদ্রলোকটী আমার পার্শ্বে বসিয়া নানারূপ কথোপকথনে আমাকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। যদ্যপি তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তথাপি তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও কোমল আমন্ত্রণে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

ছাত্রাবাস হইতে আমার পরমহিতৈষী বন্ধুবর বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এতক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। গাড়ী ছাড়িবার অধিক বিলম্ব নাই। তাঁহাকে বিদায় দিতে প্রাণে একটু কষ্ট হইল; তিনি আমার অসময়ের বন্ধু; আমার অজ্ঞাতে আমার জন্য যে কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কোনও উপকার করিতে পারি নাই—আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এত বল নাই। তাঁহার কথা ভাবিতে ভাবিতে হাবড়া ষ্টেসন ছাড়িয়া অনেকদূর চলিয়া আসিলাম।

নিবিড় তমসাচ্ছন্না রজনী—বহিঃপ্রকৃতির কিছুই নয়ন-গোচর হয় না। সঙ্গিগণের অনুকরণে দেহ বিস্তার করিবা-মাত্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

অতিপ্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, গয়া-ষ্টেসন আরও ১।০ ঘণ্টার পথদ্বারা ব্যবহিত; উষারাগ-রঞ্জিতা মধুময়ী প্রকৃতি মৃদু মৃদু হাসিতেছে! কি অপূর্ব্ব সে দৃশ্য! প্রভাত-সমীরণ উভয়পার্শ্বস্থ নিবিড় শালবন কম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, মৃদু হিল্লোলে নাতিদীর্ঘ-তরুরাজি বেপথুমতী—বুঝি, একে অন্যের নিকট অস্ফুট-কণ্ঠে প্রাণের আবেগ জ্ঞাপন করিতেছিল! অরুণোদয়ে বালুকাময় বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সোনার কিরণ ছড়াইয়া পড়িল, আর তৃণ-গুল্ম-সমাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি অনতিদূরে মধুচক্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল! চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র, মধ্যে ঘন-সন্নিবিষ্ট পর্ব্বতরাজি;—যেন বিশ্রাম-প্রয়াসী অর্দ্ধশয়ান করিযূথ! আবার বহুদূরে অত্যুচ্চ প্রস্তরময় পর্ব্বতগুলি কৃষ্ণ-নীরদবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল।

অক্লান্ত গতিতে আমাদিগের গাড়িখানি দীর্ঘ বিসর্পিত লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া ছুটিতেছে—বিরাম নাই। অকস্মাৎ সব অন্ধকার—সব স্তব্ধ! সেই বাল-রশ্মি-বিধৌত বালুকাময় প্রান্তর—বুঝি বা, সমস্ত জগৎ—মুহূর্ত্তের জন্য কাহারও করালবক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, তাই এই বিচিত্র অনুভূতি! বোধ হইল, যেন আমরা এক ভয়াবহ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিলাম। সেই নিবিড় অন্ধকারে ক্ষণকালের জন্য দৈত্যকুলের ভৈরবনাদের ন্যায় ভীষণ হুঙ্কার শ্রুত হইল; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই অরিকুলকে যেন ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিয়া বিজয়-গর্ব্বে আমাদের গাড়ীখানি দ্বিগুণতর বেগে বাহিরে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িল! এবম্প্রকার অভিনব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আমরা তিনটী 'টানেল' অতিক্রম করিলাম।

প্রাতে ৬টার সময় আমাদের গাড়ি গয়া-ষ্টেসনে উপনীত হইল। অমনি ফেরিওয়ালার দল, "চাই পুরী, কচুরী", "চাই গরম চা" ইত্যাদি নানাপ্রকার বিকট শব্দে একটা বিশৃঙ্খলা জন্মাইয়া দিল। যাত্রিকুল এ-দিক ও-দিক ছুটাছুটি করিতেছিল। কোনও কোনও আরোহী অবতরণ করিবামাত্রই দুর্দ্দান্ত পাণ্ডার কবলে কবলিত হইলেন। কেহ বা তাড়াতাড়ি

মুখ-হাত ধৌত করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

আমাদের কামরায় ইত্যবসরে তৎপ্রদেশীয় পাঁচজন অভ্যাগত আসিয়া স্থান অধিকার করিলেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে ব্যস্ত; সকলেই থাকিয়া থাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী আধার হইতে তাম্বূল-রচনান্তে চর্ব্বণ করিতেছিলেন;—সকলেই প্রৌঢ়, অথচ বেশ বিলাসী ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিস্তীর টুপী তাঁহাদের শিরোদেশের মধ্যভাগ অতিসন্তর্পণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে;—অনাবৃত স্থানে নাতিদীর্ঘ কেশরাশি বক্রাকারে শোভা পাইতেছে। এই বেশ-বিন্যাসে তাঁহাদের যে একটী একতার আভাস পাইয়াছিলাম তাহা বঙ্গদেশে অতিবিরল।

গয়া-ষ্টেসন ছাড়িয়া ট্রেন দ্রুত-গতিতে চলিল। সৌরকরতপ্ত বালুকারাশি উত্তাপ বিকীরণ করিতেছিল। অকস্মাৎ ট্রেণের গতি সংযত হওয়ায় উদ্গ্রীব হইয়া দেখিলাম, একটী সুবৃহৎ সেতুবন্ধ; নিম্নে প্রশান্ত শোননদ দেহ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে;—তাহাতে গর্জ্জন নাই, কল্লোল নাই, তরঙ্গের উৎক্ষেপ নাই, তরঙ্গভঙ্গ নাই; উভয়পার্শ্বে বালুকাময় বিস্তীর্ণ পুলিন। বহুদূর পর্য্যন্ত স্বচ্ছ-সলিল ও বালুকারাশি ব্যতীত আর কিছুই নয়ন-গোচর হয় না। অমিত বলে বলীয়ান্ হইয়া ধীর-গম্ভীরভাবে শোননদ যেন বিশ্রাম লাভ করিতেছে! তাহাতে তাহার উৎকণ্ঠা বা আবেগ নাই। কিন্তু প্রাবৃট্-সমাগমে এই শোন-নদই নিতান্ত অসংযত হইয়া পড়ে এবং দুকূল প্লাবিত করিয়া ভীমবেশে সজ্জিত হয়। নদীর এই বিশালত্ব উপলব্ধি করিতে করিতে আমরা বহুদূরে চলিয়া গেলাম, কিন্তু তথাপি সেতুবন্ধের শেষ নাই! এতাদৃশ সুদীর্ঘ সেতু-বন্ধ আমার ক্ষুদ্র কল্পনায় সম্ভব হয় নাই!

বেলা ৯॥টার সময় মোগলসরাই-ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। ইহা একটী সুবিখ্যাত জংসন। এ স্থানে আউধ্-রোহিলখণ্ড রেলপথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-পথ সহ মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে অহোরাত্রব্যাপী যাত্রিকুলের কোলাহল এবং ব্যস্ততা! আমরা বোম্বে-মেল হইতে অবতরণ করিয়া, ওভারব্রীজ (overbridge) দিয়া ষ্টেসনের অপরপার্শ্বস্থ প্লাট্ফরমে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তাহার পর জনতা ঠেলিয়া বহুকষ্টে একটী মধ্যম-শ্রেণীর কামরার নিভৃত কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিলাম।

এইবার সঙ্গিগণ সব বাঙ্গালী। গাড়ী অনেকক্ষণ প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইল। ইত্যবসরে অনেকেই সন্দেশাদি ক্রয় করিয়া গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। আমি নিশ্চেষ্ট; ভাবিলাম, লোকগুলি বড়ই উদর-পরায়ণ। একজন বৃদ্ধ একটী রোরুদ্যমান শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সঙ্গিনীদিগের দূরত্বের জন্য নিতান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া পড়িলেন। কারণ, তাঁহার পরিবারাদি সকলেই স্ত্রীলোকদিগের কক্ষে।

এই সময় এক প্রামাণিক আসিয়া এক সুন্দরদর্শন যুবকের চিবুকে সফেন-তুলিকা-সঙ্ঘর্ষান্তে ক্ষৌর-চালনা করিয়া দিল। কিয়ৎকাল-মধ্যেই যুবকের বদনাকৃতি সংশোধিত হইল। আমার মনে পড়িল, দ্বিজেন্দ্র-

বাবুর কথা। বৰ্দ্ধমান-ষ্টেশনে এমনই ভাবেই স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলালের হরিনাথ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। ধন্য কবিবর, ধন্য তোমার স্বাভাবিকী কল্পনা। তুমি নূতনভাবে যে হাসির উৎস ছুটাইয়া দিয়াছ, তাহা যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া বঙ্গের প্রত্যেক প্রাঙ্গণে প্রবাহিত থাকিবে।

গাড়ী মোগলসরাই ছাড়িয়া দ্রুতবেগে ছুটিল। রাস্তার দুইধারে কত কি দেখিলাম, মনে নাই; তখন উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ক্ষণকাল পরেই সেই পুণ্যদৃশ্য দেখিতে পাইব, নয়ন-মন সার্থক হইবে। যে পুণ্য-তীর্থের নাম-স্মরণে মুমূর্ষু পুলকিত হয়, বৃদ্ধের জীর্ণদেহে বল-সঞ্চার হয়—পাপী তাপীর প্রাণ শীতল হয়, আজ কত সুকৃতির ফলে প্রাণ ভরিয়া তাহা দেখিব, জীবন ধন্য হইবে! এই সব ভাবিতে ভাবিতে আমরা গন্তব্যস্থানের মধ্যবর্ত্তী ডফ্‌রীন সেতুর উপর আসিয়া পড়িলাম। গঙ্গার উপর সেই ডফ্‌রীন সেতু। তথা হইতে কাশীধামের দৃশ্য অতীব রমণীয়! দেখিলাম, অৰ্দ্ধচন্দ্রাকারে পূত-সলিলা জাহ্নবী পুণ্যতীর্থকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ঘন-সন্নিবিষ্ট শুভ্র হর্ম্ম্যাবলী দেবাধিদেব বিশ্বনাথের পবিত্র হাস্যরাশির ন্যায় প্রতীয়মান হইল। স্থানে স্থানে পবিত্র মন্দির-চূড় ত্রিদিবের সহিত পুণ্যতীর্থের নৈকট্য প্রতিপাদন করিতেছিল। গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় গতিশীল জনস্রোত। পবিত্র সলিলে অসংখ্য তরণী নাচিতেছে! এই পরম-রমণীয় দৃশ্য সন্দর্শনে প্রাণমন ভক্তিরসে আপ্লুত হইল; বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম।

অদূরে কাশী-ষ্টেসন (রাজঘাট)। ষ্টেসনের উপকণ্ঠে একটী ধরমশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়া এই ষ্টেসনেই অবতরণ করিলাম। অমনি দানবরূপী পাণ্ডাকুলের ভীষণ উপদ্রব। তাহাদের হস্তে নিরীহ ধৰ্ম্মপ্রাণ যাত্রিগণের লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। এই নিরক্ষর অর্থগৃধ্নু পাণ্ডাগণ শান্তিধামকে সর্ব্বক্ষণ ভয়াবহ করিয়া তুলিতেছে; তাহাদের তাড়নায় ভক্তির উৎস শুষ্ক হইয়া যায়—প্রাণে দারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

যাহা হউক, তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া একজন কুলীকে প্রদর্শক নির্ব্বাচনান্তে দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই ধরমশালায় উপনীত হইলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে কুলীপ্রবর দ্বিতলের একটি কক্ষে দ্রব্যজাত রক্ষা করিয়া, ঘরটী পরিষ্কার করিয়া দিল এবং ধরমশালার একজন ভৃত্যকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থলে এরূপ সহানুভূতি বিশেষ কার্য্যকরী, সন্দেহ নাই। ভৃত্যকে পুরস্কারের আভাস দিয়া, যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

ধরমশালাটী একটী সুবিস্তীর্ণ দ্বিতল চক্‌মিলান। প্রায় তিনশত লোক একত্রে অবস্থান করিতে পারে, এরূপ সুবন্দোবস্ত আছে। ভিতরে একটী প্রাঙ্গণ, তাহাতে যাত্রিদলের ব্যবহারার্থ কুসুমোদ্যান এবং জলের কল আছে। এই ধর্ম্মশালায় বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা অতিবিরল।

ক্ষণকাল বিশ্রামের পর ভৃত্যের উপদেশানুসারে কক্ষদ্বারে তালা বদ্ধ করিয়া স্নানার্থ গঙ্গার উদ্দেশ্যে বহির্গত হইলাম।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর। চতুর্দ্দিক্ ধূলি-সমাচ্ছন্ন। সৌরকরতপ্ত রাজপথে ঘুরিতে ঘুরিতে গঙ্গা খুঁজিয়া পাইতেছি না। অবসন্ন হইয়া যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সকলেই গঙ্গার নৈকট্য জ্ঞাপন করে। অবশেষে প্রায় দুইক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া এক সঙ্কীর্ণ গলিমুখে উপনীত হইলাম ও আরও কত দূর যাইতে হইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। অবশেষে অগণিত প্রস্তর-সোপানাবলী অতিক্রম করিতে করিতে কেদার-ঘাটে নামিয়া একটু বিশ্রাম লাভ করিলাম। নগর-রাজবাটী। রাজপ্রাসাদ গঙ্গাগর্ভের কিয়দ্দূর অধিকার করিয়া অচল-অটলভাবে দণ্ডায়মান।

এই স্থানে গঙ্গা অত্যন্ত বেগবতী। অবগাহনে তৃপ্ত হইলাম—ক্লান্তি বিদূরিত হইল, প্রাণ-মন শীতল হইল। যে গঙ্গার মাহাত্ম্য যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া সমগ্র ভারতে কীর্ত্তিত হইতেছে—যে নাম কীর্ত্তনে হিন্দুর গৃহকোণ অনুক্ষণ পবিত্র হইতেছে,—অন্তিম-শয্যায় ঘোরপাতকী যাহার আশায় উৎফুল্ল হইতেছে,—যাহার বারি বিন্দুমাত্র পান করিয়া মুমূর্ষু
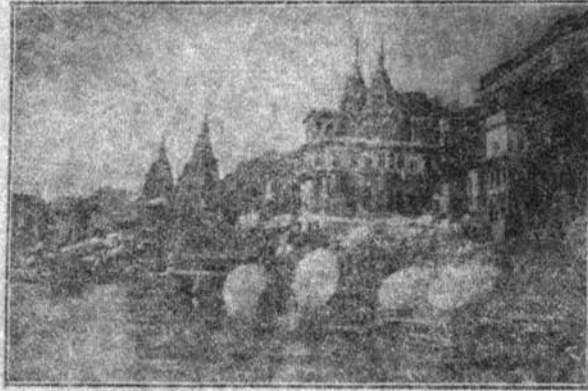
কাশীর গঙ্গা-তীর।

সহর হইতে গঙ্গা বহু নিম্নে। এজন্য তাহাকে নিকট হইতেও খুজিয়া পাওয়া যায় না। অত্যুচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর ও সোপানাবলীতে সহরটী সুরক্ষিত। খরস্রোতা গঙ্গা সীমাবদ্ধা। পাছে এই অমূল্য রত্নকে মা গ্রাস করিয়া ফেলেন, এইজন্য মানবের এত শ্রম এবং অধ্যবসায়। গঙ্গার অপর পার্শ্বে গঙ্গাপুলিন অতিক্রম করিয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে—কোনও গ্রাম বা জনপদ তথায় নয়ন-গোচর হয় না! অদূরে রাম- মৃত্যু-যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেছে, জন্মাবধি যাহার পুণ্যপ্রভাব প্রাণে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, আজ সেই পূত-সলিলা গঙ্গায় অবগাহন করিয়া প্রাণে বিমল আনন্দ উপভোগ করিলাম।

কেদার-ঘাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে কত দেব মন্দির দেখিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোথাও ঘণ্টা বাদিত হইতেছে, মন্দিরাভ্যন্তরে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে, ধূপধূম বিনির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে, সদ্যঃস্নাত যাত্রিবৃন্দ অবিরাম

চলিয়াছে ;—সর্ব্বত্র ব্যস্ততা এবং সজীবতা। সকলের মুখে 'হর হর'-রব, সকলেই ভক্তিরসে পরিপ্লুত।

ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রায় ২টা বাজিয়া গেল ; স্নান-মাহাত্ম্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণার তীব্রতা অনুভব করিলাম। দক্ষোদরের জন্ম বতন্তর কায়িক ক্লেশ স্বীকার করিয়া রন্ধন করিলাম। জঠরানল নির্ব্বাপিত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভারত-ভূমি।

ধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি ভারত-ভুবন,
অনন্ত রতন যাহে, সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার!
না আছে কোথাও আর এমন তুলন,
"স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননী আমার!

পবিত্র এ পুণ্য-ভূমে লভিয়া জনম,
রাখিলা অতুল কীর্ত্তি মায়ের সন্তানে।
জ্ঞান, ধর্ম্ম, শৌর্য্য, বীর্য্য যতেক করম,
না দেখি ভারত-বিনা অন্য কোন স্থানে!

অতীত কালের গর্ভে কত বর্ষ গত!
যখন আছিলা মাতা সৌভাগ্যশালিনী,
ছুটিত সীমান্ত-পথে যশোরাশি যত,
মলয়-অনীল-সম অতি-গরবিনী!

অমর-বাঞ্ছিত যেথা সুন্দর-নগরী ;
অধিষ্ঠিতা রাজ-লক্ষ্মী ভারত-আসনে!
হেরিয়ে মায়ের এই অপূর্ব্ব মাধুরী,
বিস্ময়ে চাহিত সবে প্রীতির নয়নে!

জ্ঞানজ্যোতিঃপূর্ণ এই ভারত-ভবনে,
অতুল বীরত্ব রাখি আর্য্য-সুতগণ
লভিল অমর কীর্ত্তি যশো-মান-ধনে,—
স্মরিলে হৃদয় হয় আনন্দে মগন।

সতীর আদর্শ-স্থল ভারত-ভুবন ;
না আছে জগত-মাঝে তুলনা ইহার ;
হিন্দু রমণীর শ্রেষ্ঠ সতীত্ব ভূষণ,—
হেলায় জীবন দেয় ধর্ম্ম করি সার!

তুমি মা জনম-ভূমি, রত্ন-প্রসবিনী!
কে বলে ভারতবাসী হইয়াছে দীন,
জননী যা'দের চির-সৌভাগ্যশালিনী,—
মাতৃস্নেহে সমতুল সুদিন-কুদিন?

ভবিষ্য আঁধারে যদি গিয়াছে মিশিয়া,
আছে মাত্র আর্য্যভূমে গৌরব কাহিনী!
কাল-নীরে স্মৃতি কভু না যাবে ভাসিয়া,
দেখিবে ভারত-মাতা চির-গরবিণী।

এই আর্য্যাবর্ত্ত হ'তে উচ্ছ্বাস-লহরী
ছুটেছে ত্রিদিব-পথে উজল প্রভায়,
ভকতি-প্রসূন ল'য়ে অমর-নগরী,
গাহিছে বন্দনা-গীতি মধুর ভাষায়।

শ্রীহেমাঙ্গিনী দেবী।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা।

আজকাল ভারতবর্ষের পুরুষদিগের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছে, এবং এই বিষয়ে অনেক মতভেদও হইতেছে। অধিকাংশ শিক্ষিত পুরুষ যে, এখন স্ত্রী-শিক্ষার অতিপ্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাধীনতা-সম্বন্ধে সকলেই ভীত। আচ্ছা, শিক্ষা ও স্বাধীনতা, এই দুইয়ের তাৎপর্য্য কি?

অনেকে মনে করেন, উচ্চশিক্ষা কেবল উপার্জ্জনের জন্য, এবং তাহার অর্থ, কেবল গোটা কতক পাশ দেওয়া; এবং স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা। সেইজন্য কেহ কেহ স্ত্রীগণের উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতার অত্যন্ত বিরোধী। তাঁহারা বলেন, 'মেয়েরা বেশী লেখাপড়া শিখিয়া কি করিবে? তাহারা ত আর চাকুরী করিবে না? স্বাধীনতা দিলেই তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া পড়িবে।' কিন্তু এই লেখাপড়া কি শুধু চাকুরীর জন্য? অথবা, কতকগুলি নভেল পাঠ করিতে ও প্রবন্ধ লিখিতে শিখিলেই কি শিক্ষার সমাপ্তি? পুরাকালে কি কেহ লেখা-পড়া জানিতেন না? এবং যাহারা জানিতেন, তাঁহারা আপনাদের অর্থোপার্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোনও সৎকার্য্য করেন নাই কি?

কি পুরুষ কি নারী, শিক্ষা সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয় বস্তু। যাহা শিখিলে মানব-জাতির অন্তঃকরণে বিশুদ্ধতা আনয়ন করিতে পারে, যাহাতে আমাদের মনের পঙ্কিলতা ধুইয়া যায়, এবং যাহাতে আমরা অন্তরের সকল প্রকার ক্ষুদ্রত্ব ও সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া উদারতা ও মহত্ত্বের ভিতরে যাইতে পারি, সেইই শিক্ষা। যখন মানবের মনে স্বার্থত্যাগ ও একতা-জ্ঞান জন্মাইবে, ও যখন মানব সকল জাতির উপর সমভাবে প্রেম বিতরণ করিতে পারিবে, তখনই শিক্ষার সার্থকতা ও সম্পূর্ণতা লাভ হইয়াছে, মনে হইবে।

তাহার পর, স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। কারণ, স্ব অর্থে আপন; সুতরাং স্বাধীন অর্থাৎ আপনার অধীন। তাহার অর্থ এই যে, আপনার ইন্দ্রিয় এবং মন নিজের বশে রাখা। তাহা হইলেই সে স্বাধীন। অতএব ইহা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজনীয়। যদি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে ক্রুর, উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী হয়, সে-স্থলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী অধিক অপরাধী হইবে না। কারণ, বিধাতার নিকট পক্ষপাতিত্ব নাই। তিনি ন্যায়বান্ বিচারক। অতএব তিনি কি পুরুষ, কি স্ত্রী, উভয়কেই সমদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।

যদি আমরা আমাদিগের বাসনা ও রিপু-সমূহের দাসবৃত্তি না করিয়া, সেইগুলিকে আপনাদিগের অধীনে রাখিতে পারি, যদি আমরা চিত্ত দমন করিতে শিখি, ইন্দ্রিয় সকল সংযত হয়, তবে আমরা অধীন কোথায়? আর তখন স্বাধীনতায় কি ভয়? সে-স্থলে স্বাধীনতার প্রভাব সর্ব্বত্র। সুতরাং, স্বাধীন

হইতে হইলে আত্মমর্য্যাদাবোধ ও আত্মরক্ষা প্রধানতঃ শিক্ষণীয়। এই উপরি উক্ত বিষয় গুলি সকলই শিখিবার বিষয়। ইহা আপনা হইতেই হয় না। পুরুষ-মাত্রেই স্বাধীন; কিন্তু অনেক পুরুষও এরূপ দুর্ব্বলচিত্ত, যাহা-দিগকে হয় ত, সমাজ ও লোকচক্ষে শিক্ষিত স্বাধীন পুরুষ বলিয়া জানা যায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা সে পদের যোগ্য নহে। কারণ, যে সকল সদ্গুণ থাকিলে যথার্থ শিক্ষিত ও স্বাধীন-পদবাচ্য হয়, তাহাদিগের মধ্যে সে সকল গুণ নাই; তাহারা এ সকল শিক্ষা করে নাই।

অতএব দেখা যায়, শিক্ষা ও স্বাধীনতা পরস্পর সমসূত্রে গ্রথিত। শিক্ষা না পাইলে স্বাধীনতার ফল ভোগ করা যায় না; এবং যে স্বাধীন নহে, সে মনুষ্যত্বও লাভ করিতে পারে না। সৎশিক্ষা ও সাধু আদর্শই স্বাধীনতা-লাভের একমাত্র প্রধান উপায়। আমরা যেরূপ দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগের বেশ-বিন্যাস করিয়া থাকি, দর্পণে প্রতিবিম্বিত আকৃতি দেখিয়া আমাদিগের সুরূপতা-কুরূপতা বিবেচনা করিয়া, সুরূপ-গ্রহণে যত্নশীল হই, সেইরূপ জগতের লভনীয় উচ্চ সাধু আদর্শগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া নিরন্তর সদসদ্ বিচার ও আত্ম-পরীক্ষা-দ্বারা আমা-দিগের স্ব-স্ব জীবন গঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য,—আমরা এই সৎশিক্ষা ও স্বাধীনতা কোথা হইতে পাইব? শিক্ষাহীন ব্যক্তির জ্ঞান জন্মায় না; এবং যে অজ্ঞানী সে হতভাগ্য। মানব তাহার চক্ষের জ্যোতিঃ হারাইলে যেরূপ অন্ধ হইয়া থাকে, যে হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক নাই সে ব্যক্তিও তদ্রূপ অন্ধ। কিন্তু যাহার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ, তাহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বস্তু-সকল দৃষ্টিগোচর হয়। যাহার অন্তর অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, যেখানে জ্ঞানের আলোক প্রবেশের বা প্রকাশের পথ নাই, তাহার উন্নতির পথও চিররুদ্ধ। যে জীবন উন্নতির সোপানে না উঠিয়া অবনতির দিকে নামিয়া যাইতে চাহে, সে কেবল ধ্বংসেরই লক্ষণ। যে মানব আপনার অন্ধত্ব ঘুচাইবার চেষ্টা না করিয়া জড়ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, সে সর্ব্বদা অবনতির মুখে দাঁড়াইয়া আছে, সে কেবল প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে মাত্র। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু প্রকৃতির নিয়মাধীন। সেই নিয়মের উল্লঙ্ঘন করিলে বিধাতৃ-বিধি অমান্য করা হয়। আমাদের অজ্ঞতাকে দূরীভূত করা আবশ্যক। গীতায় আছে, 'নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।—ইহ-লোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই।' জ্ঞানই উন্নতির মূল সোপান। এই জ্ঞানের আধার শিক্ষা। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উৎপত্তি। শিক্ষার প্রধান পথ বা উপায় বিদ্যার্জ্জন।

আমরা গুরূপদেশ, সদ্গ্রন্থ-পাঠ, ও সদা-লোচনা প্রভৃতি দ্বারা যাহা কিছু জানিতে বা বুঝিতে পারি, তাহাকেই বিদ্যার্জ্জন করা বলে। এই বিদ্যা-বলেই মানব-সমাজ আজ পৃথিবীর সকল জাতীয় জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। আপনাকে প্রতিষ্ঠার আসনে বসাইতে হইলে, বিদ্যার্জ্জন তাহার সদুপায়। কি কর্ম্ম, কি ধর্ম্ম, সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের বিদ্যা-দ্বারা লাভ হয়। বিদ্যা-দ্বারাই আমরা আমা-

দিগের আদর্শ খুঁজিয়া পাই, বিদ্যা সদ্বিবেচনা আনয়ন করে এবং বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া জ্ঞানালোক প্রবেশের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। যে দেশের লোকেরা এখনও অশিক্ষিত ও অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া বাস করিতেছে, তাহাদিগকে অসভ্য-নামে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধিহীন অবিবেচক নর পশুর মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে। স্থূলকথা,—মানুষকে মনুষ্যত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে একমাত্র বিদ্যাই আশ্রয়ণীয়। বিদ্যা ভিন্ন শিক্ষা হয় না। অতএব প্রকৃত শিক্ষা না পাইলে মনুষ্য-জীবন গঠিত হয় না, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এই যে শিক্ষা, ইহা কি কেবল পুরুষের জন্যই? সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতির পথে যাইতে হইলে শুধু পুরুষের শিক্ষালাভই কি যথেষ্ট? নর ও নারী উভয়কে লইয়াই মানবজাতির সৃষ্টি; অর্থাৎ, মনুষ্য বলিতে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়কেই বুঝায়। অতএব পুরুষের যদি শিক্ষা-লাভের আবশ্যকতা হয়, তবে স্ত্রীর হইবে না কেন? নারীজাতি কি মনুষ্যজাতির মধ্যে নহে? আর যদি নারীজাতি অন্য কোনও জাতীয় জীবের মধ্যেই পরিগণিত হয়, তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে যে ধারণা হইয়া আসিতেছে যে, নারী নরের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ, তাহা কিরূপে সম্ভব হইত? অতএব কি নারী কি নর—মনুষ্যত্ব-লাভের সার্থকতা পাইতে হইলে, শিক্ষা উভয়ের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ, মনুষ্যত্ব উভয়েরই বাঞ্ছনীয়। পুরুষের পুরুষত্ব ও নারীর নারীত্ব রক্ষাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। যথার্থ শিক্ষালাভ করিতে পারিলেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি ও মনুষ্য-পদের যোগ্য হই।

এখন আমাদের দেশের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইতেছে, তাহাতে নারীদিগকে অন্ধকারে রাখিয়া পুরুষ একা জ্ঞান-ধর্ম্মের আলোকে অগ্রসর হইলে কখনই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে না।

শ্রীঅমলা দেবী।

লক্ষ্মী-পূজা।

নমি পদযুগে হে মহালক্ষ্মি, রত্ন-আকর-সুতা,
বিশ্বম্ভরের প্রেয়সী গৃহিণী, বিশ্ব-বিভব-যুতা।
সম্বলহীন ধ্যান গায়ত্রী, আমি মা অধম দীন,
কুণ্ঠিত হৃদি বহিয়া এনেছি করিতে চরণে লীন!
সংগ্রহ করি শত উপচার, আয়োজনে
ঢালি প্রাণ,—
গরবে ছলিতে, আসি নি দেখাতে
কপট পূজার ভান!
ভরিয়া এনেছি নিঃস্ব হৃদয় অকপট প্রয়োজনে,
শূন্য দু'হাত পাতিয়া এসেছি,
নিলাজ পীড়িত মনে!
ধরার স্নুধা সে, ঈর্ষা ও দ্বেষে ক্রূর
ছলনায় হাসি'

জাগে যা জীবনে শত অতৃপ্তি, প্রমাদ,
জড়তা-রাশি !
বাহ্য বিভব কামনায় তাই,
তৃষিত হৃদয়-ভায়া
ছুটে না ছুটে না ; সে শুধু ছলনা,
সে যে মিছা মৃগ-আশা !

চাহে না সে-সব ক্ষুধাতুর দীন,শুক মলিন প্রাণ ;
হে ধন-ধান্য-অধিষ্ঠাত্রি, দেহ মোরে শ্রেয় দান !
আত্মার কাছে নিত্য যা আছে,
দাও সে বিত্ত প্রাণে,
চিত্তের ক্ষুধা, তৃপ্ত কর মা, চির অমৃত দানে !

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

পূজার কথা।

সতী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক ছিলুম সিদ্ধি কলিকায় সাজিয়া লইয়া, ভাল করিয়া উহাতে এক দম্ টানিয়া নন্দী ত্রিশূল-হস্তে সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "কৈ রে, আয়—আয়। যাত্রার সময় হোলো—কে যাবি এই বেলা আয়।"

মা একখানি গৈরিক বসন পরিয়া, হাতে, কাণে, গলায় ও মস্তকে কেবলমাত্র ফুলের অলঙ্কারে সাজিয়া, সিংহবাহিনী হইয়া সেই-খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু বিষাদে ভরা, মুখে উৎসাহ বা আনন্দের কোনও চিহ্ন নাই—অঙ্গে একখানিও রত্ন-অলঙ্কার নাই।

ভৃঙ্গী ও ষাঁড়টী তাঁহার পায়ের তলায় গড়াইয়া পড়িতেই তাঁহার চক্ষু এইবার কেমন সজল হইয়া উঠিল। অদূরে শিবের সাধনভূমি, কয়েকটী কেতকী-বৃক্ষের ফাঁক দিয়া অল্প অল্প লক্ষিত হইতেছিল। শিবের চরণ-চুটী এখনও সেব-লুক্কায়িত নবারুণের মত সেইখানে জলিতেছে—দৃষ্ট হইল। সতী লুব্ধনেত্রে বারংবার সেই দিকেই চাহিতে চাহিতে কোনওরূপে আত্মসংবরণ করিয়া সিংহকে অগ্রসর হইবার ইঙ্গিত করিলেন। ভূতপ্রেতগুলি, কেহবা বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া, কেহ বা মড়ার হাড় লইয়া, কেহ-বা ডমরু, শিঙা ও ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া মহাকোলাহলে পার্ব্বত্যভূমি কাঁপাইয়া চলিল।

এ-দিকে এই কাণ্ড। ও-দিকে দক্ষের আলয়ে মহাসমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অবাধ্য জামাতার উপরে রীতিমত প্রতিশোধ লইবার জন্য, প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহাকেও দক্ষ নিমন্ত্রণ করিতে বাকী রাখেন নাই। ত্রিদিবের বড় বড় সকল দেবতা, যক্ষ, রক্ষ ও কিন্নরগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। দক্ষের আত্মীয়-দিগের মধ্যেও প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। অসংখ্য কন্যার মধ্যে সতী ছাড়া সকলেই

পতিপুত্র ও অন্যান্য পরিজনসহ উপস্থিত। জামাতারা প্রত্যেকেই এক এক দিকে এক এক কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যম, চন্দ্র ও অগ্নি—ইঁহারা সকলেই দক্ষের জামাতা;—তাঁহাদের ছুটাছুটিতে ও হাঁকে-ডাকে দক্ষপুরী সরগরম! কেহ নিমন্ত্রিতদের আহার্য্য পরিবেশন করিতেছেন, কেহ যজ্ঞ-স্থলের জিনিষপত্রাদির খবরদারি করিতেছেন, কেহ-বা আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্তে মন দিয়াছেন।

চন্দ্র নিতান্ত সুশীল; তিনি অভ্যাগত-দিগের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে যজ্ঞের কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল, সেই খবর লইতেছেন। যমরাজ শাসনকার্য্যে অত্যন্ত পটু;—তিনি চারিদিকের শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। অগ্নি আমোদ-প্রমোদাদির সুশৃঙ্খলা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনগণ আরও অসংখ্য কার্য্যে মাতিয়া উঠিয়াছেন।

নিমন্ত্রিতেরা একে একে প্রায় সকলেই উপস্থিত হইলে দক্ষ কহিলেন, "আর দেরী কেন? এইবার যজ্ঞ আরম্ভ করা যাইতে পারে।"

ভৃগু প্রভৃতি কয়েক জন ঋষি এই শিবহীন যজ্ঞে দক্ষের প্রধান সহায়। তাঁহারা কহিলেন, "যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ও ভগবান্ প্রজাপতি কি কহেন, তাহা জানা দরকার।"

বিষ্ণু চুপ করিয়া একপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। শিবের অভাবটা তাঁহার চক্ষে যজ্ঞভূমিটাকে নিতান্তই অস্বস্থ ও অপ্রীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছিল। ঈষৎ মাথা নাড়িয়া তিনি কহিলেন, "তাই তো! ভগবান্ প্রজাপতি কি বলেন?"

ব্রহ্মাও নিরানন্দ এবং অন্যমনস্ক ছিলেন। বিষ্ণুর কথা শুনিয়া হঠাৎ বিশেষ কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, আর দেরী কেন? যজ্ঞ আরম্ভ হোক্।"

যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া গেল। মহাসমারোহে ভৃগু অন্যান্য কয়েক-জন হোতার সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। দক্ষ আসিয়া সদম্ভে নিকটে বসিলেন। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আবার ডাক পড়িল। তিনি কহিলেন, "নারদের সহিত একটু বাক্যালাপ করিয়া আসি, ক্ষণিক অপেক্ষা কর।" সে কথা শুনিয়া দক্ষ ঈষৎ ভ্রুকুটী করিলেন। কিন্তু উপায় নাই। স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু।—সকলেই স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় বাহিরে সুগভীর 'কিচিমিচি' শব্দ উত্থিত হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া মাথা তুলিতেই দক্ষ দেখিলেন—এক অদ্ভুত দৃশ্য। দক্ষ দেখিলেন, দর্শকদিগের সেই বিষম জনতার মধ্যে অদূরে দাঁড়াইয়া কয়েকটা কাল কাল কি! কি-বা উহাদের চেহারা, এবং কি-বা উহাদের বিকট আনন্দোচ্ছাস! হি হি করিয়া তাহারা হাসিতেছে, আর দর্শক-দিগকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া, আপনাদের জন্য যতটা পারে, সম্মুখে জায়গা করিয়া লইতেছে! দক্ষ আরও দেখিলেন, কয়েকটা আসিয়া পা ছড়াইয়া একবারে সম্মুখেই আরাম করিয়া বসিল! সমস্ত গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেবতা ও অপ্সরা-দের মধ্যে তাহাদের বিকটমূর্ত্তিগুলি অতিশয় অদ্ভুতভাবে 'চিকৃমিক্' করিতে লাগিল।

দক্ষ বুঝিতে পারিলেন, কোন্ রাজ্যের মহামান্য আগন্তুক ইহারা। যদিই-বা প্রথমে না বুঝিতে পারিয়া থাকেন, কিন্তু বাহিরের

টী কলরবে অবিলম্বেই তাহা বুঝিতে
লন। রাগে তাঁহার অঙ্গ জলিয়া গেল।
একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
সব কোথা হইতে আসিল?"

সে উত্তর করিল, "সতী আসিয়াছেন, তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি।"

দক্ষ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না; রাগিয়া কহিলেন, "কি? এত বড় স্পর্দ্ধা! নিমন্ত্রণ করিলাম না, তবু আসিল! আচ্ছা রসো, মজা দেখাইতেছি!" তারপর উচ্চৈঃস্বরে প্রহরীদিগকে হুকুম দিলেন, "সব আপদ্-গুলোকে তাড়াইয়া দাও; ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দাও।"

ভূতেরা অতশত জানে না। মায়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ;—কত খাইবে, নাচিবে—মনে করিয়া আসিয়াছে। এখন খাদ্যের পরিবর্ত্তে কীল-ঘুষোর ব্যবস্থা দেখিয়া তাহারা হতবাক্ হইয়া গেল! কোন সভাতেই কেহ তাহাদের এমন "দূর দূর" করে না। আজ মায়ের সঙ্গে আসিয়া এই অপমান! তাহারা বিস্ময়বিমূঢ়-ভাবে সকলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া জায়গা ছাড়িয়া দিতে লাগিল, আর দুম-দাম করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে সতীর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল।

জননী প্রসূতির নিকট বসিয়া সতী অভিমানাশ্রু পরিত্যাগ করিতেছিলেন। তাহাদিগকে এভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভূতেরা কহিল, "তাড়াইয়া দিল যে!"

দুর্-দুর্ করিয়া সতীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "কে তাড়াইয়া দিলে? কেন তাড়াইয়া দিলে?"

"যজ্ঞস্থল হইতে প্রহরীরা তাড়াইয়া দিয়াছে; আর শুধু তাড়াইয়াই দেয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে মার-ধরও করিয়াছে!" এই বলিয়া ভূতেরা যে-যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখাইতে লাগিল। কেহ পীঠ দেখাইল, তাহার চামড়া উঠিয়া গিয়াছে; কেহ নাক দেখাইল, অনেকটা নাই; কেহ কান দেখাইল, টানের চোটে তাহা লম্বা হইয়া গিয়াছে!

সতীর অন্তরে দারুণ ব্যথা অনুভূত হইল। মাতার নিকটে ছেলেপিলে, যত কুৎসিত-কদাকারই হউক, যত অপদার্থই হউক, অতুল স্নেহের পাত্র! সতীও ইহাদিগকে তেমনি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এই দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া ও দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

প্রসূতি উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "ওকি মা অমন করিলে কেন? ভাবিও না; আমি মিটাইয়া দিতেছি! ও-সব কিছু নয়। জামাতারা কোথা গেল?"

অভিমানের বহ্নি সতীর অন্তরে পূর্ণমাত্রায় জলিয়া উঠিল। শিবকিঙ্করদের উপায় করিবেন ওই জামাতারা? এতই তুচ্ছ শিব? ছি! ছি! ছি!

প্রসূতি চলিয়া গেলেন। সতী আস্তে আস্তে যজ্ঞভূমির দিকে চলিলেন। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতেই আরও একটী দৃশ্য তাঁহার নয়ন-সম্মুখে পতিত হইল।

সতীকে নামাইয়া দিয়া সিংহটা গাছতলায় পড়িয়া আরাম করিতেছিল; একটা অনুচর তাহাকে খোঁচা লইয়া তাড়িয়া আসিল! তাহা দেখিয়া সে-ও কেশর নাড়িয়া ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সতী দেখিলেন, একটীমা

শূলের খোঁচা খাইতেই সে একেবারে লাফাইয়া, তাহার ঘাড়ের উপর পড়িবার উপক্রম করিয়া দিয়াছে আর কি! সতী তাড়াতাড়ি সিংহকে ডাকিয়া ফিরাইলেন।

সিংহের চক্ষু রক্তবর্ণ, লেজ প্রসারিত, কেশরগুচ্ছ অসম্ভবরূপ স্ফীত। গায় হাত বুলাইয়া সতী তাহাকে কহিলেন, "ছি! ছি! পশুরাজ, ও কি!—ছি!" তারপর অনুচরটীর সম্মুখে যাইয়া সপ্রশ্নদৃষ্টিতে দাঁড়াইলেন। অনুচর সতীকে সম্মুখে দেখিয়া, হঠাৎ, "মা, আমার দোষ নাই; প্রজাপতির হুকুম আমি পালন করিয়াছি মাত্র," এই বলিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। সতী কথা কহিতে না পারিয়া এইবার যজ্ঞবেদীর নিকটে আসিয়া দেখা দিলেন। দক্ষ মন্ত্রপাঠের উদ্যোগ করিতে-ছিলেন, সতীকে দেখিয়া কহিলেন, "ভাঙ্গড়ের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে তোরও লজ্জা-সম্ভ্রম গেল, দেখিতেছি! ছি! ছি! ছি! সতি, কে তোকে এই সব জন্তু ও লোকদের লইয়া আসিতে বলিল?"

সতী পিতা ও অন্যান্য গুরু-ব্যক্তিকে অভিবাদন জানাইয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "পিত্রালয়ে কন্যা আসিবে, তাহার আবার অনুমতি কি পিতঃ? আমি নিজের ইচ্ছাতেই এইখানে আসিয়াছি, এবং ইহাদিগকেও আমার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। ইহাতে কি অপরাধ হইয়াছে?"

লজ্জায় ও ঘৃণায় দক্ষ মুখ বিকৃত করিলেন; কহিলেন, "সে জ্ঞান তোর থাকলে হ'ত। তা'হলে কি তুই ভাঙ্গড়ের সেবা করিস্? না, শিবের কথাতেই এইসব ভূতপ্রেত সঙ্গে নিয়ে এইখানে আসতে [illegible] পাস?"

দারুণ মনস্তাপে সতী কহি[illegible] "যিনি কোনও দোষে দোষী নন্, দোষ[illegible] যিনি অতীত, কল্পনা করিয়া কেন তাঁ[illegible] বৃথা কটূক্তি করেন, পিতা? শুনিলাম, শিব[illegible] যজ্ঞ করিতেছেন। ইহা কি আপনার উচিত[illegible] না, ইহা নিরাপদ? শিবহীন যজ্ঞ কে করিতে পারে? সে তো দেবতাদেরও অসাধ্য।"

দক্ষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কি? কন্যা হইয়া এত বড় বড় লম্বা লম্বা কথা কহিস্! আমার সাক্ষাতেই ভাঙ্গড় স্বামীর গর্ব্ব! আচ্ছা, রোস্; তোর শিবের অহঙ্কারটা ভাঙ্গিতেছি। একবার তার কাহিনীটা বলি তবে—শোন্।"

এই বলিয়াই দক্ষ সদম্ভে মস্তক তুলিয়া সেই সম্মিলিত দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক শিব-নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিলেন। গায়ের জ্বালায় শিবের কত কুৎসাই দক্ষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।—শিব ভাঙ্গড়—ভাঙ্ খায়; শিব অনাচারী—যেখানে-সেখানে পড়িয়া থাকে; শিবের মানসম্ভ্রম-জ্ঞান নাই, যত ছোট লোকের সঙ্গেই তার মেলা-মেশা;—নন্দী, ভৃঙ্গী ও ভূত-প্রেতগুলা তার নিত্যসাথী; শিব আস্ত জন্তু;—ব্যাঘ্রছাল পরে—সাপের হার কণ্ঠে দেয়।"—এইরূপ আরও কত কি বলিয়া দক্ষ যে শিবের কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন তাঁহা বলা সুকঠিন।

দক্ষ বলিয়া যাইতেছেন, আর সভাস্থিত সকলে মগ্ন হইয়া শুনিতেছে; এমন সময় অকস্মাৎ সতীর দিকে চাহিয়া নিষ্ঠুর বক্তা হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন। দক্ষের বাক্য-রোধের সঙ্গে সঙ্গে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের দৃষ্টিও সেই দিকে পড়িল;—তাঁহারাও তখন স্তব্ধ

হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। ভৃগু প্রভৃতি হোতৃগণ যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দিতে দিতে হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে চাহিয়া একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন! তাঁহাদের হস্তস্থিত পাত্র আর নামিতে চাহিল না! একটা কি শক্তিতে চরাচর যেন এক মুহূর্ত্তে স্পন্দনহীন হইয়া গেল!

সকলে দেখিলেন, দেবী নিশ্চল পাষাণবৎ আকাশ-পথে দৃষ্টি স্থির করিয়া করযোড়ে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন,—তাঁহার সামান্য বস্ত্রাঞ্চলটাও যেন যোগমগ্ন হইয়া স্থির হইয়া আছে! শীর্ণ কাঞ্চনপ্রভ-কায়, অঙ্গস্থিত কুসুমরাশির স্নিগ্ধ জ্যোতিঃর সহিত মিলিয়া, পবিত্রতার আলোকে চারিদিক ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সেই পবিত্রতার মধ্যে, তাঁহারই প্রাণের মত, সকল মূর্ত্তিই ধ্যান-মগ্ন! বাহিরের কোন কিছুতেই যেন সে মূর্ত্তির কোন অনুভূতি নাই। চক্ষের দৃষ্টি বাহিরে নিবদ্ধ হইলেও অন্তরের মধ্যেই তাহার সাধনার বস্তু পাইয়া সে তন্ময়! দেহের ও অন্তরের মধ্যে একখানি যেন সুস্পষ্ট আবরণ টানিয়া দিয়া দেবী যজ্ঞাগ্নির পার্শ্বে ক্রোশে বস দেখিতেছেন!

সতীর এই দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া, দূরে গবাক্ষ-সমীপে দাঁড়াইয়া প্রসূতি আকুল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "সতি, সতি, মা আমার! চলে আয়, বুকের ধন আমার, বুকে আয় মা! আয়, ওখানে থাকিস্ নে; বুকে আয়!" একটা আশু বিপদের সম্ভাবনা জননীর স্নেহকাতর হৃদয়কে মথিত করিয়া তুলিতেছিল। তাঁহার সেই কাতর আহ্বান যজ্ঞস্থলে অনেকেই শুনিতে পাইলেন, কিন্তু সতীর ধ্যান-মগ্ন অন্তরের কঠিন বর্ম্ম ভেদ করিয়া উহা তাঁহাকে কিছুতেই সচেতন করিয়া তুলিতে পারিল না। সতী ক্রমেই অসাড়—আরও অসাড় হইয়া পড়িতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে এক অতিবিচিত্র ব্যাপারই সংঘটিত হইল।

সতীর দেহ ক্রমে নমিত হইল ও চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল। একটী রেখার মত জ্যোতিঃ হঠাৎ সেই দেহ হইতে নির্গত হইয়া আকাশে ধূপশিখার মত যজ্ঞাগ্নিতে মিলাইয়া গেল! এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহটিও কুণ্ডের মধ্যে লুটাইয়া পড়িয়া গেল।

চারিদিকে প্রবল আর্ত্তনাদ উঠিল। গবাক্ষপার্শ্বে প্রসূতি, "সতি, সতি" বলিয়া এইবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। দর্শকগণ, "এ কি হইল, এ কি সর্ব্বনাশ," বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। দ্বারে নন্দী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া ব্যাপার দেখিতেছিলেন; এক্ষণে এক গগনভেদী হুঙ্কার ছাড়িয়া তিনিও ত্রিশূল-হস্তে লাফাইয়া উঠিলেন। সিংহ ব্যাপার কি, এতক্ষণ ভাল বুঝিতে পারে নাই; সকলকে সমবেত-স্বরে চীৎকার করিতে এবং দেবীর দেহকে ঐরূপভাবে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া সে লম্ফপ্রদানে কুণ্ডের সম্মুখীন হইল। পিশাচেরা 'কিল্ বিল্' করিয়া যজ্ঞ-সভায় প্রবেশ করিয়া মহাগোলযোগ বাধাইয়া দিল। এমন কি, এমন যে দক্ষ, তাঁহারও মুখ হইতে অলক্ষ্যে একটা আর্ত্তস্বর নির্গত হইল।

কিন্তু এ সবই এক মুহূর্ত্তের ব্যাপার মাত্র! —তাহার পরেই এক মহামারী কাণ্ড! নন্দীর হুঙ্কারে ও ত্রিশূল-চালনায়, সিংহের দাপটে ও ভূতপ্রেতের তাণ্ডবনৃত্যে, তেমন যে যজ্ঞস্থল, তাহাও মুহূর্ত্তে শ্মশান-ভূমিতে

পরিণত হইল। গন্ধর্ব, কিন্নর ও দেবতা—প্রাণভয়ে সকলেই পলায়নপর হইলেন। সাহস করিয়া প্রতিবাদ বা সম্মুখীন হইবার মত কাহাকেও পাওয়া গেল না। দক্ষ নিরুপায় হইয়া সশঙ্কে ভৃগুর দিকে চাহিলেন।

যজ্ঞ পণ্ড হয় দেখিয়া, (ভৃগু তাড়াতাড়ি কি করিবেন!)—যজ্ঞরক্ষার কামনায় যজ্ঞাগ্নিতে একটা প্রকাণ্ড আহুতি দিয়া বসিলেন। সেই আহুতি হইতে হঠাৎ এক উজ্জ্বলাকৃতি বীরের উদ্ভব হইল। উহার নাম ঋভু! হস্তে প্রকাণ্ড এক খড়্গ! দক্ষের ইঙ্গিতে সে অত্যল্পকালের মধ্যেই প্রবল বিক্রমে সকলকে যজ্ঞভূমি হইতে তাড়াইতে লাগিল; এবং যজ্ঞভূমি ক্রমশঃ পরিষ্কার করিয়া দিল। তাহার পরাক্রমে পরাভূত হইয়া নন্দী ও ভূতের দলকেও অবশেষে প্রস্থান করিতে হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

গানের স্বরলিপি।

(গান)

মিশ্র সাহানা—কাওয়ালি।

বরিষ আশিস্-কণা য়ুরোপের মাঝে!
প্রীতির মঙ্গল ভেরি প্রতি প্রাণে বাজে।
য়ুরোপের ঘরে ঘরে
দীপ জ্বলে পুণ্য-করে,
প্রতি আঙ্গিনায় তব হেম-পীঠ রাজে,
সিঞ্চ নির্ব্বাণ-বারি উহাদের মাঝে।
মুছে যাক্ দ্বেষ-দ্বন্দ্ব,
যত মোহ যত সন্দ,
উঠুক সকল চিত্তে সাধনার মহানন্দ;
সাজাও য়ুরোপ-চিত্ত ধর্ম্মময় সাজে।
প্রেমের আলোকে সব,
পাক্ শান্তি অভিনব,
হে রাজাধিরাজ! বুঝি' তব বৈভব
বিরত হয় যেন ভ্রাতৃ-হিংসা কাজে॥*

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

০ ১ ২´ ৩ ॥
।। {মা মা রা মা । রা রা সা সা । রা -া পা মপা । মা মা জ্ঞা -া}।।
ব রি ষ আ শি স্ ক ণা য়ু ০ রো পে র মা ঝে ০

০ ১ ২´ ৩
। মা -পা পা পা । পণা -ধণা পা -ধা । মা পা -র্সা র্সা । মজ্ঞা -া -জ্ঞমা -পা ।।
প্রী তি র ম ঙ্গ ল ০ ভে রি প্র তি প্রা ণে বা ০ জে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
।। { না -া -া না । -া -া না -া । র্সা র্সনা র্সা র্রা । না -া র্সা র্সা }
য়ু ০ ০ রো ০ ০ পে ০ ০ র ০ ঘ রে ০ ঘ রে

---

* মেট্রোপলিটান্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের জনৈক ছাত্র কর্ত্তৃক বিরচিত।

শীলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২৫

শীলা শয়ন-কক্ষে গিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। সে ভাবিল, সে কোন্ সৌভাগ্য-বলে এ কয় দিন এমন সুখী হইয়াছিল! কেন সে সুখ চিরদিন থাকিল না? সুপ্রকাশ আসা পর্য্যন্ত সে কি হোটেলে থাকিতে পারে না? —না। তাহা হইলে সে পাগল হইয়া যাইবে। সে তাহা কোনও মতে পারিবে না।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাক্স খুলিয়া সেই পুরাতন প্যাকেটটি,—যাহাতে 'লীলাবতী দাস' লেখা ছিল,— খুলিয়া দেখিল, একখানি পত্র। পত্রখানি ইংরাজীতে লেখা।—

"প্রিয় মহাশয়,

আপনার প্রেরিত অর্থ পাইলাম। ধন্যবাদ। আপনি কি আর এখানে আসিবেন না? আপনাকে একবার দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছি। আপনি দুঃখিনীর প্রতি যে দয়া করিতেছেন, তাহা কখনও ভুলিব না। আমার ছেলে-দুইটি ভাল আছে। জগদীশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন। ইতি।

আপনার দাসী—
লীলাবতী।"

পত্রে এমন কোনও কথা নাই, যাহাতে মনের ভাব বিকৃত হয়। যদি কাগজে মকদ্দমার কথা না পড়িত, শীলা ইহাতে কিছুই মনে করিত না। এই নির্জ্জন স্থানে সে একাকী থাকিতে ইচ্ছা করিল না। সে বুঝিতে পারিল না যে, সে কি করিবে! সে তাড়াতাড়ি একখানি চিঠি লিখিল। তাহার স্বামীকে এই সে প্রথম পত্র লিখিতেছে। সে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কোনও ভাবই মনে স্থির করিয়া আনিতে পারিল না; উঠিয়া চিঠি লিখিতে বসিল:—

"আমি লক্ষ্নৌ যাইতেছি; কাকাবাবুর বাটীতে থাকিব। মিঃ সুব্রত বসু আসিয়া এই কাগজ ও চিঠি দিয়াছেন; দিলাম, দেখিও। আমি জানি না, কি করা উচিত বা কি বলা উচিত। তুমি যাহা বুঝাইতে পার, বুঝাইও। এখানে কোনও মতে থাকিতে পারিতেছি না—"

পত্র অসমাপ্ত রহিল,—আর লেখা হইল না। শীলার মাথার ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, সে অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। আয়া পাশের ঘরে ছিল; ছুটিয়া আসিয়াই শীলাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

দুখ্‌মন্ বেহারা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কেয়া হুয়া আয়াজী?"

আয়া। আরে মেম্‌সা'ব কা হো গিয়া! জল্‌দি ডাগ্‌দার বোলাও। সাহেব কিধর গিয়া?—কব আয়েগা? *

দুখমন। সা'ব কাল আয়েগা। হাম্ জানেসে হোগা নেই। হোটেলকো ডাগ্‌দারকো বোলানেসে হোগা। †

---

* আয়া। মেমসাহেব কি-রকম হয়ে গেছেন! শীঘ্র ডাক্তার ডাক। সাহেব কোথায় গিয়াছেন? কবে আসিবেন?

† সাহেব কাল আসিবেন। আমি যাইলে হইবে না। হোটেলের ডাক্তারকে ডাকিতে হইবে।

নিজে সারারাত্রি সেইখানে থাকিয়া সংবাদাদি লইলেন।

সকালে ট্রেন নাই; বেলা একটায় ট্রেন আসে। ততক্ষণ সকলেই ব্যস্ত হইয়া রহিলেন। শীলার জ্ঞান হইবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার 'ব্রেন ফিভার' বলিয়া জানাইলেন যে, হটাৎ অত্যন্ত আঘাত পাইয়া এ পীড়া হইয়াছে। শৈলেন ১০ টার পর কলেজে চলিয়া গেলেন; বলিয়া গেলেন যে, আবশ্যকতা হইলেই যেন 'নর্স' সংবাদ দেয়। সুব্রত তখন বসিবার কক্ষে আসিয়া বসিয়াছিলেন; শৈলেন চলিয়া গেলেন, তিনি দেখিলেন।

১টার পরই সুপ্রকাশ আসিয়া উপস্থিত। টেলিগ্রাম পাইয়াই তাঁহার মন এমন অস্থির হইয়াছিল যে, তিনি কি ভাবে যে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়াই সুব্রতকে দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন, "আপ্‌নি এখানে! শীলা কেমন আছে?"

সুব্রত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিষণ্ণকণ্ঠে বলিলেন, "আমার দোষেই শীলার প্রাণ যেতে বসেছে। আপ্‌নার কাছে কি সব বোল্‌বো?"

সুপ্রকাশ। (ব্যস্ত হইয়া) কি বোল্‌বেন? শীগ্‌গির বলুন, আপনি কি করেছেন?

সুব্রত। শীলাকে আপ্‌নার সেই 'ডাইভোর্স কেসের' বিষয় জানিয়েছি। আপনি যে তাকে সে কথা না বোলে বিয়ে কোরেছেন, তাই জানিয়েছি। এখনো যে লীলাবতী দাস এখানে আছেন, তাকে যে আপ্‌নি মাসহারা দেন, তাও সব জানিয়েছি। আর আপ্‌নার আশ্রয় ছাড়্‌তে পরামর্শও দিয়েছিলাম। শীলা অন্নদাবাবুর কাছে লক্ষ্ণৌ যাবে বোলে বস্ত্রাদি ঠিক্ কর্‌তে গিয়েছিল; আমায় বোলেছিল, আপ্‌নি আস্‌লে এই পত্র ও কাগজ দিতে; সেইজন্যে আমি বাধ্য হ'য়ে এখানে আছি। শীলা আপ্‌নাকে যে পত্র লিখ্‌তেছিল, দেখুন। ডাক্তার-সাহেব আমায় এ দিয়ে গেছেন।

সুপ্রকাশ পত্রখানি হস্তে লইয়া সুব্রতর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপ্‌নি অভিমুখের মত কি অন্যায় কোরেছেন! যাক্, এ কথা পরে হবে; শীলাকে আগে দেখে আসি।"

সুব্রত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "আপ্‌নি কি বলেন, এ-সব কিছু নয়? এ-সব কথা কি উড়িয়ে দেওয়া উচিত? শীলা আমাদের ঘরের বৌ হ'লে, তার পক্ষে কত ভাল হ'ত!"

সুপ্রকাশ অবিচলিত নেত্রে সুব্রতর প্রতি চাহিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "মিঃ বসু, আমার দিকে চেয়ে দেখুন; আপ্‌নার কি মনে হয়, আমি এই অপরাধে অপরাধী? ঠিক্ কোরে বলুন ত!"

সুব্রত তাঁহার সেই নির্দ্দোষ মুখের দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "যদি মুখের ভাবে মানুষ চিন্‌তে হয়, তা হ'লে আপ্‌নি নির্দ্দোষী; কিন্তু এত যে প্রমাণ!"

সুপ্রকাশ। সে কথা পরে হবে। বলুন, আমার দিকে চেয়ে বলুন, আপ্‌নার কি মনে হয়?

সুব্রত। আমার মনে হয় বটে, আপ্‌নি নির্দ্দোষ। যদি নির্দ্দোষ হন, আমি আপ্‌নার কাছে চিরকালের জন্যে বাধিত হব। আপ্‌নি আমায় প্রমাণ দেখান, তা হ'লে

শীলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২৫

শীলা শয়ন-কক্ষে গিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। সে ভাবিল, সে কোন্ সৌভাগ্য-বলে এ কয় দিন এমন সুখী হইয়াছিল! কেন সে সুখ চিরদিন থাকিল না? সুপ্রকাশ আসা পর্য্যন্ত সে কি হোটেলে থাকিতে পারে না? —না। তাহা হইলে সে পাগল হইয়া যাইবে। সে তাহা কোনও মতে পারিবে না।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাক্স খুলিয়া সেই পুরাতন প্যাকেটটি,—যাহাতে 'লীলাবতী দাস' লেখা ছিল,— খুলিয়া দেখিল, একখানি পত্র। পত্রখানি ইংরাজীতে লেখা।—

"প্রিয় মহাশয়,

আপনার প্রেরিত অর্থ পাইলাম। ধন্যবাদ। আপনি কি আর এখানে আসিবেন না? আপনাকে একবার দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছি। আপনি দুঃখিনীর প্রতি যে দয়া করিতেছেন, তাহা কখনও ভুলিব না। আমার ছেলে-দুইটি ভাল আছে। জগদীশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন। ইতি।

আপনার দাসী—
লীলাবতী।"

পত্রে এমন কোনও কথা নাই, যাহাতে মনের ভাব বিকৃত হয়। যদি কাগজে মকদ্দমার কথা না পড়িত, শীলা ইহাতে কিছুই মনে করিত না। এই নির্জ্জন স্থানে সে একাকী থাকিতে ইচ্ছা করিল না। সে বুঝিতে পারিল না যে, সে কি করিবে! সে তাড়াতাড়ি একখানি চিঠি লিখিল। তাহার স্বামীকে এই সে প্রথম পত্র লিখিতেছে। সে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কোনও ভাবই মনে স্থির করিয়া আনিতে পারিল না; উঠিয়া চিঠি লিখিতে বসিল :—

"আমি লক্ষ্ণৌ যাইতেছি; কাকাবাবুর বাটীতে থাকিব। মিঃ সুব্রত বসু আসিয়া এই কাগজ ও চিঠি দিয়াছেন; দিলাম, দেখিও। আমি জানি না, কি করা উচিত বা কি বলা উচিত। তুমি যাহা বুঝাইতে পার, বুঝাইও। এখানে কোনও মতে থাকিতে পারিতেছি না—"

পত্র অসমাপ্ত রহিল,—আর লেখা হইল না। শীলার মাথার ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, সে অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। আয়া পাশের ঘরে ছিল; ছুটিয়া আসিয়াই শীলাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

দুশ্‌মন বেহারা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কেয়া হুয়া আয়াজী?"

আয়া। আরে মেম্‌সা'ব কা হো গিয়া! জল্‌দি ডাগ্‌দার বোলাও। সাহেব কিধর গিয়া?—কব আয়েগা? *

দুশ্‌মন। সা'ব কাল আয়েগা। হাম্ জানেসে হোগা নেহি। হোটেলকো ডাগ্‌দারকে বোলানেসে হোগা। †

---

* আরে, মেমসাহেব কি-রকম হয়ে গেছেন! শীঘ্র ডাক্তার ডাক। সাহেব কোথায় গিয়াছেন? কবে আসিবেন?

† সাহেব কাল আসিবেন। আমি যাইলে হইবে না। হোটেলের ডাক্তারকে ডাকিলে হইবে।

নিজে সারারাত্রি সেইখানে থাকিয়া সংবাদাদি লইলেন।

সকালে ট্রেন নাই; বেলা একটায় ট্রেন আসে। ততক্ষণ সকলেই ব্যস্ত হইয়া রহিলেন। শীলার জ্ঞান হইবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার 'ব্রেন ফিভার' বলিয়া জানাইলেন যে, হটাৎ অত্যন্ত আঘাত পাইয়া এ পীড়া হইয়াছে। শৈলেন ১০ টার পর কলেজে চলিয়া গেলেন; বলিয়া গেলেন যে, আবশ্যকতা হইলেই যেন 'নস' সংবাদ দেয়। সুব্রত তখন বসিবার কক্ষে আসিয়া বসিয়াছিলেন; শৈলেন চলিয়া গেলেন, তিনি দেখিলেন।

১টার পরই সুপ্রকাশ আসিয়া উপস্থিত। টেলিগ্রাম পাইয়াই তাঁহার মন এমন অস্থির হইয়াছিল যে, তিনি কি ভাবে যে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়াই সুব্রতকে দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন, "আপ্নি এখানে! শীলা কেমন আছে?"

সুব্রত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিষণ্ণকণ্ঠে বলিলেন, "আমার দোষেই শীলার প্রাণ যেতে বসেছে। আপ্নার কাছে কি সব বোল্‌বো?"

সুপ্রকাশ। (ব্যস্ত হইয়া) কি বোল্‌বেন? শীগ্‌গির বলুন, আপনি কি করেছেন?

সুব্রত। শীলাকে আপ্নার সেই 'ডাইভোর্স কেসের' বিষয় জানিয়েছি। আপনি যে তাকে সে কথা না বোলে বিয়ে কোরেছেন, তাই জানিয়েছি। এখনো যে লীলাবতী দাস এখানে আছেন, তাকে যে আপ্নি টাকা দেন, তাও সব জানিয়েছি। আর আপ্নার আশ্রয় ছাড়্‌তে পরামর্শও দিয়েছিলাম। শীলা অন্নদাবাবুর কাছে লক্ষ্ণৌ যাবে বোলে বস্ত্রাদি ঠিক্ কর্ত্তে গিয়েছিল; আমায় বোলেছিল, আপ্নি আস্‌লে এই পত্র ও কাগজ দিতে; সেইজন্যে আমি বাধ্য হ'য়ে এখানে আছি। শীলা আপ্নাকে যে পত্র লিখ্‌তেছিল, দেখুন। ডাক্তার-সাহেব আমায় এ দিয়ে গেছেন।

সুপ্রকাশ পত্রখানি হস্তে লইয়া সুব্রতর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপ্নি অতিমূর্খের মত কি অন্যায় কোরেছেন! যাক্, এ কথা পরে হবে; শীলাকে আগে দেখে আসি।"

সুব্রত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "আপ্নি কি বলেন, এ-সব কিছু নয়? এ-সব কথা কি উড়িয়ে দেওয়া উচিত? শীলা আমাদের ঘরের বৌ হ'লে, তার পক্ষে কত ভাল হ'ত!"

সুপ্রকাশ অবিচলিত নেত্রে সুব্রতর প্রতি চাহিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "মিঃ বসু, আমার দিকে চেয়ে দেখুন; আপ্নার কি মনে হয়, আমি এই অপরাধে অপরাধী? ঠিক্ কোরে বলুন ত!"

সুব্রত তাঁহার সেই নির্দ্দোষ মুখের দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "যদি মুখের ভাবে মানুষ চিন্‌তে হয়, তা হ'লে আপ্নি নির্দ্দোষী; কিন্তু এত যে প্রমাণ!"

সুপ্রকাশ। সে কথা পরে হবে। বলুন, আমার দিকে চেয়ে বলুন, আপ্নার কি মনে হয়?

সুব্রত। আমার মনে হয় বটে, আপ্নি নির্দ্দোষ। যদি নির্দ্দোষ হন, আমি আপ্নার কাছে চিরকালের জন্যে বাধিত হব। আপ্নি আমায় প্রমাণ দেখান, তা হ'লে

সুব্রত পূর্ব্বের সেই কক্ষেই বসিয়াছিলেন। তিনি পার্শ্বের ঘরে চীৎকার প্রভৃতি শুনিতে-ছিলেন, কিন্তু কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় ডাক্তারকে লইয়া ঢুখ্‌মন সেই স্থানে আসিল। ডাক্তার ইংরাজ। তিনি সুব্রতকে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? তদুত্তরে সুব্রত বলিলেন, "আমি জানি না। আমি এইমাত্র আসিয়াছি; তবে, মিসেস্ রায় কোনও দুঃসংবাদ পাইয়াছেন!"

ডাক্তার আয়ার সহিত গিয়া শীলাকে শয্যার উপর তুলিয়া শয়ন করাইলেন। জ্ঞান কিছুতেই হইল না দেখিয়া, ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া, 'পুনরায় আসিয়া দেখিব' এই বলিয়া ডাক্তার যখন বাহিরে আসিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, শৈলেন আসিয়াছেন। শৈলেন সেই তৎক্ষণাৎ আসিয়াছেন। ডাক্তার আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "Where is Mr. Roy?" *

শৈলেন। He has gone to Kalka; will return tomorrow. †

ডাক্তার বলিলেন, "Mrs. Roy is very ill. The case looks serious. You ought to send a telegram to Mr. Roy to come positively by to-morrow's train. I hope that some-body will look after her. I will come by and by." ‡ এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

শৈলেন সুব্রতকে দেখিয়া বলিলেন, "ম'শায় কি এইখানেই আছেন?"

সুব্রত। হাঁ, আমি মিসেস্ রায়ের পরিচিত।

শৈলেন। হঠাৎ পীড়িত হইবার কারণ কি?

সুব্রত। কারণ—? হয় ত, আমিই কারণ! আমি তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে কোন একটা কথা বলেছিলাম।

শৈলেন। সুপ্রকাশ রায়ের বিরুদ্ধে কথা! আপনি, বুঝি, তাঁকে জানেন না?—সর্ব্বনাশ কোরেছেন!—

এমন সময় আয়া চীৎকার করিয়া "ঢুখ্‌মন! ঢুখ্‌মন!" বলিয়া ডাকিল। শৈলেন ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, শীলা একে-বারে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। সে শয্যায় স্থির থাকিতেছে না; খুব জ্বরও হইয়াছে। আবার ডাক্তারকে ডাকা হইল। ডাক্তার বলিলেন, একজন 'নার্স' না হইলে চলিবে না। নর্স একজন এখনই চাই। শৈলেন নর্স আনিতে চলিয়া গেলেন ও টেলিগ্রামে সুপ্রকাশকে শীঘ্র ফিরিতে বলিলেন।

সুব্রত সেই হোটেলেই একটী কক্ষ লইয়া রহিলেন। শীলার এই সাংঘাতিক পীড়া! আর তাঁহার জন্যই পীড়া! এই সকল ভাবিয়া তাঁহার অন্তর যেন চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল!

শৈলেন একজন 'নর্স' আনিয়া দিলেন ও

---

* মিঃ রায় কোথায়?

† তিনি কাল্‌কা গিয়াছেন। কাল আসিবেন।

‡ মিসেস্ রায় অত্যন্ত পীড়িতা। তাঁহার রোগ সাংঘাতিক দেখাইতেছে। মিঃ রায়কে কল্যকার ট্রেনে নিশ্চয় আসিবার জন্য আপনার টেলিগ্রাম করা উচিত। আশা করি, ইঁহাকে কেহ দেখিবেন। আমি এখনই আসিতেছি।

আপনার ওপর আমার যে ভাব, সব চলে যাবে।

সুপ্রকাশ। দেখাব, এইখানে বসুন। আর দেরী করা নয়। আগে শীলার জীবন ফিরিয়ে পাই, তবেই নিজের নির্দ্দোষতা প্রমাণ কোর্ব্বো, তা নয় ত নয়।

এই বলিয়া সুপ্রকাশ দ্রুতপদে শীলার কক্ষে চলিয়া গেলেন। তিনি সেখানে গিয়া দেখিলেন, তথায় একজন নর্স আছেন এবং আয়াও আছে। তিনি যাইবা-মাত্র নর্স বলিল, "মিঃ রায়, আপ্‌নি কথা বল্‌বেন না। রোগী যেন হঠাৎ জেগে না উঠে।" সুপ্রকাশ নর্সের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, ধীরে ধীরে শীলার নিকট গিয়া তাহার তুষারশুভ্র ললাটদেশ স্পর্শ করিলেন; ললাট জলন্ত-বহ্নিসম উত্তপ্ত। সুপ্রকাশ শয্যার পার্শ্বে ভূমিতে জানু পাতিয়া বসিয়া শীলার দুইটি হস্ত নিজ-হস্ত-মধ্যে ধারণ করিয়া শয্যোপরি মস্তক স্থাপন করিলেন। নর্স ও আয়া কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সুপ্রকাশ সেইস্থানে একমনে জগদীশ্বরকে ডাকিয়া শীলার প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। তাঁহার সেই কাতর প্রার্থনা জগদীশ্বরের নিকট বিফলে গেল না। শীলা সুপ্রকাশের স্পর্শে যেন চেতনা ফিরিয়া পাইতেছিল। সে একবার অন্যদিকে ফিরিল। সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে সেই সুন্দর ললাটদেশে পুনরায় করস্পর্শ করিলেন। তাহার পর তিনি উঠিয়া নর্সকে ডাকিয়া, ডাক্তারকে ডাকিতে বলিলেন।

নর্স ডাক্তার ডাকিয়া আনিলে, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "She is much better. I hope she will gain her strength soon. Be careful, don't talk too much. Try to keep her quiet." *

সুপ্রকাশ ডাক্তারের সহিত বাহিরে আসিলেন, এবং কি কি করিতে হইবে, সব জানিয়া লইলেন। তাহার পর সুব্রতকে বলিলেন, "আপ্‌নি কি এই হোটেলেই আছেন?"

সুব্রত। হাঁ।

সুপ্রকাশ। অনুগ্রহ কোরে আরও কয়েক দিন থাকুন। আপ্‌নার মনের ভাব দূর কোর্ত্তে চেষ্টা কোর্ব্বো।

এমন সময় শৈলেন আসিয়া পড়িলেন। শৈলেন ব্যস্তভাবে বলিলেন, "সুপ্রকাশ-দা বৌদি কেমন আছেন?"

সুপ্রকাশ। একটু ভাল ত, ডাক্তার বল্লেন। শৈলেন, তুমি এসেছ, বড়ই ভাল হয়েছে। এখন মিঃ বসুকে তোমায় আমার সব কথা বোল্‌তে হবে। আমি ভাই, তোমার স্ত্রীর জীবনের জন্যে অনেক দিন ত সয়েছি; অপমানের বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছি।

শৈলেন। (ইতস্ততঃ করিয়া ভয়-চকিত-নেত্রে সুপ্রকাশের দিকে চাহিয়া) কিন্তু সুষমা ত, জান, সব সময়ই আমার ওপর সন্দিগ্ধ; আমার বিষয় কিছু শুন্‌লেই তার রসাতল! সে যদি এ-সব শোনে, তবে সে ত আর বাচ্‌বে না। আমি কি শেষে স্ত্রী-হত্যাকারী হব!

সুপ্রকাশ। এ-দিকে, ভাই, আমার শীলা যে যায়! আমায় কি ভাই, এই বোঝা

---

* ইনি অনেকটা ভাল। আমি আশা করি যে, শীঘ্রই ইনি বল লাভ করিবেন। সাবধান, বেশী কথা বলিবেন না। ইঁহাকে শান্ত রাখিতে চেষ্টা করুন।

নিয়ে চিরকাল থাকতে নয় ? তোমার একটু বিবেচনা করা ত উচিত। (সুব্রতর প্রতি) আচ্ছা, মিঃ বসু, আপ্‌নি যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যা শুন্‌বেন তা কাউকেও বল্‌বেন না, শুধু শীলাকেই বল্‌বেন, তবেই সত্যি কথা শুনতে পাবেন। তা নয় ত, থাক্ আমার ঘাড়ে কলঙ্কের বোঝা! কেন মিছে বেচারী শৈলেনকে বিপদ্‌গ্রস্ত করা!

সুব্রত ইঁহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অপরিসীম আশ্চর্য্যে অভিভূত হইতেছিলেন। কৌতুহল- ও বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন, "মহাশয় আমি শপথ কোরে [illegible]ছি যে, আমি আর কাউকেও বোল্‌বো না, আপ্‌নি আমায় বলুন। আমিই শীলার এই দশা করিছি। আমার এ বিষয় জানা নিতান্ত দরকার।

সুপ্রকাশ শৈলেনের প্রতি চাহিলে, শৈলেন অস্পষ্ট হইতে ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতর কণ্ঠে বলিলেন, "মিঃ বসু! সে মকদ্দমা সুপ্রকাশ-দার নামে হয় নি; আমার নামেই হয়েছিল। আমার নাম শৈলেন রায়,—এস, রায়। কাগজে ভুল কোরে 'এস রায়, জমীদার', লিখেছিল। মাসীমা যখন এখানে হাওয়া বদ্‌লাতে আসেন, সুপ্রকাশ-দা তখন এদেশে ছিলেন না; কোল্‌কাতায় জমীদারীর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মাসীমার কাছে আমিই ছিলাম। তখন আমার বিবাহের এন্‌গেজমেণ্ট হয়ে গিয়েছিল। মাসীমার সেবার জন্যে আমি মিসেস্ দাসকে নিযুক্ত করি। তিনি মাসীমার কাছে প্রায়ই তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে নানা কথা বোল্‌তেন যে, তাঁর স্বামী অত্যন্ত মাতাল ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করেন। কোন খানে কাজ নিলেও তাঁকে নানা কথা বলেন, কাজ না কর্‌লেও প্রহার করেন ইত্যাদি। একদিন আমাদের বাড়ীতে এসে তিনি মিসেস্ দাসের কাছে টাকা চান। টাকা না পাওয়ায়, তিনি মিসেস্ দাসকে প্রহার করিতে আরম্ভ করায়, আমি মাসীমার আদেশ-মত চাকর দিয়ে তাঁকে আমাদের বাড়ী থেকে বাহির করিয়ে দিই। শেষে সেই অবস্থায় সেই লোক আমাকে মিঃ রায় জমিদার, মনে কোরে, আমার নামে ১০ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের দাবী দিয়ে, আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-ভঙ্গের জন্যে নালিশ করেন। পরে আমি টেলিগ্রাম কোরে সুপ্রকাশ-দাকে আনাই। আমার স্ত্রীর দিদিমা তখন এলাহাবাদে ছিলেন। তিনি কেমন কোরে এই সব কথা শুনেছিলেন; তাই তিনি ব্যস্ত হ'য়ে এখানে আসেন। তিনি সব জানেন। সুপ্রকাশ-দা যখন দেখ্‌লেন যে মিঃ এস রায়-জমীদার, বোলে নালিশ করেছে, তখন হেসে উঠ্‌লেন। মাসীমা কিন্তু তাঁকে আদালতে দাঁড়াইতে হয়, তা চাইতেন না। সুপ্রকাশ-দা বল্লেন, 'শৈলেন বেচারির বিয়ের ঠিক্ হয়েছে, তার নামে কথাটা উঠ্‌লে, নানারকম গোল হবে; বিয়ে হয় ত হবে না! ওকে আমি বিলেতে পাঠিয়ে দেব। আমার নামে বল্লে কি হবে ? আমি গ্রাহ্য করি না।' তখন সুপ্রকাশ-দা বিয়ে কোর্ব্বেন না, স্থির করেছিলেন। মকদ্দমার দিন ঠিক হয়ে গিয়েছিল। হটাৎ তার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় মিঃ দাস আমাদের বাড়ীর গেটের পাশ থেকে আমাকে লক্ষ্য কোরে বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে, কেমন ভাবে বন্দুক টানেন যে, তা

তাঁর মাথা ভেদ কোরে চলে যায়। সে কি কাণ্ড!—পুলিশ-এজাহার!—এখনো মনে হলে কি রকম মনে হয়! সুপ্রকাশ-দা আমার জন্যে সব সহ্য করেছেন। আজ, আমার জন্যে তাঁর নির্দ্দোষ নামে এত কলঙ্ক! আজ আমার জন্যে তাঁর স্ত্রী যায় যায়! এ সব শুন্‌লে হয় ত আমার স্ত্রীও বাঁচ্‌বে না।" এইসব বলিতে বলিতে শৈলেন সেইস্থানে বসিয়া দুই হস্তে আপনার মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন।

সুব্রত সমস্ত ইতিহাস শ্রবণ করিয়া, সুপ্রকাশের প্রতি চাহিয়া, তাঁহার দুইটি হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "আপনি দেবতা; আপ্‌নার মত যে মানুষ হয়, তা আমি জান্‌তুম না। পরের জন্যে আপ্‌নার এত ত্যাগ-স্বীকার! আপ্‌নার পায়ের ধূলো দিন্, আমি মাথায় নিয়ে ধন্য হব। শীলাকে আমি এখন নিজের বোনের মতই দেখি, আর দেখ্‌বোও। আপ্‌নি আজ থেকে আমার নিজের বড় ভাইয়ের মত হ'লেন। আমায় যা যখন আদেশ কোর্ব্বেন, আমি পালন কোর্ব্বো।"

সুপ্রকাশ সুব্রতর প্রতি বিস্ময়-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আগে শীলাকে ফিরিয়ে পাই, নতুবা সব বৃথা হবে। যাই হোক্, এ কথা আর জানাজানি কর্ব্বার অবশ্যকতা নেই; শুধু আপ্‌নি নিজে শীলাকে বোল্‌বেন। আপ্‌নি এখন এখানেই থাকুন্। আপ্‌নি আজ থেকে আমার অতিথি।" তারপর শৈলেনের প্রতি চাহিয়া তিনি বলিলেন, "শৈলেন, ওঠ ভাই, তোমার কোনও দোষ নেই। একথা সুষমাকে কেউ বোল্‌বে না। বল্লেও কোন ক্ষতি নেই।"

শৈলেন। (সুব্রতকে) আসুন, আপ্‌নাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই।

তাঁহারা উঠিলেন। এমন সময় আয়া দ্বারের নিকট হইতে বলিল, "হুজুর মেমসাহেব-কো হোঁস্ আনে পর হুয়া—।"

সুপ্রকাশ দ্রুতপদে আয়ার সহিত চলিয়া গেলেন। সুব্রতকে লইয়া শৈলেন হোটেলের বাহিরে গমন করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

অজ্ঞাতাভাস।

মুক্ত করি ত্রস্ত করে দক্ষিণ-দুয়ার,
মলয় বহিছে আজি বসন্ত-সথার
যেন কি সন্দেশ ল'য়ে! নিভৃত-প্রাণের
গোপন মরমতলে কা'র চরণের
মধুর নূপুর বাজে! পুলকে ব্যথায়
চকিতে শিহরি চিত্ত উন্মত্তের প্রায়
করে কা'র অন্বেষণ! উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল
ক্ষণে ক্ষণে সারা হৃদি, হারায়ে দু'কূল
অকূলে ভাসিতে চায়! স্বপনের কোলে
বেজে উঠে বাঁশী যেন মদির-হিল্লোলে
কেড়ে লয়ে প্রাণ-মন! অতৃপ্ত যৌবন
মাধবী পুষ্পের মত বিকশি কেমন,
চেয়ে রয় কা'র করে সঁপি আপনায়
শোভিবে কোমল বক্ষ চুম্বন-মালায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

প্রীতি-উপহার।

তোমাতে আমাতে সখি,
রহিলেও ব্যবধান,
তোমারি মধুর স্মৃতি
রহে পূর্ণ সারা প্রাণ।
মরমের তালে তালে
নিরলে নিভৃতে নিতি,
তোমারি রাগিণী বাজে
অবিরত ঢেলে প্রীতি।

এ নব বরষে আজি
লইয়া নবীন আশা,
অরপিনু তব করে
"উপহার ভালবাসা।"
যদিও বা অতিতুচ্ছ
সৌরভ-বিহীন ফুল,
তবু আশা,—হৃদি-নভে
দিবে আলো তারা তুল।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ঊনবিংশ অধ্যায়—আকস্মিক দুর্ঘটনা।

মনুষ্য-জীবনে অনেক সময় অনেক আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এই দুর্ঘটনাগুলির প্রতিবিধান জানা থাকিলে, তাহা সময়ানুসারে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। মহিলাগণের এ-সকল বিষয়ে বিলক্ষণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেইজন্য নিম্নে কতকগুলি দুর্ঘটনার প্রতিবিধান লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

আহত স্থানের চিকিৎসা।

কখনও কখনও বালক-বালিকাদিগের হস্তে ছুরিকা লাগিয়া বা কাচ ফুটিয়া রক্তস্রাব সঙ্ঘটিত হয়। এইরূপ সময়ে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে:—

(ক) ক্ষতস্থান শীতল জলের দ্বারা ধৌত করিয়া, তাহার ভিতরের ময়লা,—ভগ্ন কাচখণ্ড বা অন্য কোনও পদার্থ, যাহা কিছু থাকে—পরিষ্কার করিয়া দিবে। নতুবা, ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হইবে না।

(খ) কর্ত্তিত মুখ-দুইটী নিকটবর্ত্তী করিয়া তাহাতে মলম দিয়া ষ্টিকিং প্লাসটার লাগাইয়া দিবে। ষ্টিকিং প্লাস্টারের টুক্‌রা অতিক্ষুদ্র হওয়া চাই।

(গ) ক্ষত-স্থান এরূপ-ভাবে রাখিবে, যেন তাহাতে নড়্‌চড়্‌ না লাগে। নড়্‌চড়্‌ লাগিলেই ক্ষত-মুখটীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এইরূপ ঘটিলে ক্ষত জুড়িতে বিলম্ব হয়।

(১) ধমনীর রক্তস্রাব।—ধমনীর রক্ত দেখিতে উজ্জ্বল, ইহার স্রাব পরিমাণে অধিক হয় এবং নিঃসৃত হইবার কালে বেগে বহির্গত হয়। এবম্বিধ রক্তস্রাব ভয়ানক বিপজ্জনক। মূল-ধমনী হইতে যদি রক্তস্রাব হয়, তবে অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা কর্ত্তব্য। ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে রক্তবমনকারী স্থানকে উচ্চে ধারণ করিয়া, তাহার উপর স্থূল বস্ত্রখণ্ড বা তদ্রূপ কোনও পদার্থ, যাহা সেই সময়ে প্রাপ্ত হইবে, রক্ষা করিয়া, রুমালদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে।

(২) শৈরিক রক্তস্রাব।—কৃষ্ণবর্ণের রক্তস্রাব দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, তাহা শিরা হইতে বহির্গত হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রেও স্রাব ক্রমাগত হইয়া থাকে। ইহার প্রতিকার পূর্ব্বোক্তরূপ।

মূর্চ্ছা।

মস্তকে আঘাত লাগিলে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হইলে, অথবা শরীরের শোণিত উত্তমরূপ অক্সিজেন না পাইলে মূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়। এরূপ স্থলে [illegible]ত নিয়মগুলি পালনীয়।

(১) রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া তাহার মস্তকটী উচ্চে স্থাপন করিবে।

(২) গলার চতুঃপার্শ্বের কাপড় খুলিয়া দিবে।

(৩) রোগীর চতুঃপার্শ্বে বিশুদ্ধ হাওয়া খেলিতে দিবে; এবং

(৪) রোগীকে শীঘ্রই নিকটবর্ত্তী হাঁসপাতালে বা ডাক্তারের নিকট লইয়া যাইবে।

মূর্চ্ছা হইলেই রোগীকে তৎক্ষণাৎ সোজা করিয়া শয়ন করাইয়া শরীরের সমান উচ্চতায় তাহার মস্তকটী রক্ষা করিবে; যেন মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া শোণিত সহজে প্রবাহিত হইতে পারে। হৃৎপিণ্ড যখন মস্তিকে রক্ত চালিত করিতে না পারে, তখনই মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। মূর্চ্ছাকালে Eau-de-Cologne অথবা নিশাদল নাকের সম্মুখে রাখিতে পারা যায়। কিন্তু মস্তকটী যেন শরীরের সমান উচ্চতায় থাকে;—এ বিষয়ে যেন ভুল না হয়। শীতল জলের ঝাপ্‌টা মুখে দিলেও রোগীর মূর্চ্ছারোগ ভাল হয়। ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য।

মূর্চ্ছাকালে রোগীকে কখনও কিছু খাইতে দিবে না। কারণ, তদ্দ্বারা তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

জলে ডুবা।*

জল নিমজ্জিত ব্যক্তির কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস স্থাপনা করিবার চেষ্টা করিবে।

---

* আজকাল জলে ডুবিলে, ডাক্তার সেফারের প্রণালীটিই (Dr. schafer's method) সহজ-সাধ্য ও অধিক ফলদায়ক বোধে অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে জলমগ্ন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে উপুড় করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হয়। রোগীর মুখটী সেবকের পরীক্ষার সুবিধার জন্য, ঈষৎ বাম বা দক্ষিণ দিকে (যে দিকে সেবক বসিবেন, সেই দিকে) ফিরাইয়া রাখা হয়। তাহার পর সেবক তাঁহার সুবিধামত রোগীর দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া রোগীর উভয় পাঁজরের উপর নিজের দুইটী হাত স্থাপন করিয়া, অল্প অল্প চাপ দিয়া তাহা উপরে বগলের কিছু নীচ অবধি উঠান। হাত-দুইটী উপরে উঠাইবার সময় চাপ অল্প অল্প বাড়াইতে হয়; এবং হাত যখন বগলের কাছে আসে, তখন চাপ একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। প্রতিমিনিটে ১২ হইতে ১৫ বার এইরূপ করিলেই যথেষ্ট। এইরূপ করিতে করিতে, কিছুক্ষণ পরে রোগীর নিঃশ্বাস পড়িতে থাকে এবং তখন তাহার নাকের কাছে হাত দিলেই উহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিঃশ্বাস

(১) তাহার অঙ্গ হইতে বস্ত্রাদি উন্মুক্ত করিয়া তাহার মুখের আবিলতাকে পরিষ্কার করিয়া দিবে।

(২) মস্তকের নিম্নে বালিশ রাখিয়া মস্তকটীকে সামান্য উচ্চ করিয়া দিবে।

(৩) রোগীর বাহুদ্বয় (তাহার কনুই-য়ের নিকট) ধারণ করিয়া, তাহা সোজা উত্তোলিত করিয়া মস্তকের পশ্চাতে লইয়া যাইবে ও পরে মস্তকের পশ্চাৎ হইতে সেই-দুইটীকে সম্মুখে লইয়া আসিয়া বক্ষে সংলগ্ন করিবে। এইরূপ ক্রিয়া চারি সেকেণ্ড পরে পরে করিবে; শীঘ্র শীঘ্র করিবে না। এইরূপে কৃত্রিম নিঃশ্বাস স্থাপিত হইবে। স্বাভাবিক শ্বাস লইতে রোগীর ১৫।২০ মিনিট, এমন কি অর্দ্ধদণ্ডা পর্য্যন্ত সময়ও লাগে।

(৪) শরীরের উষ্ণতা যথাসম্ভব রক্ষা করিবার জন্য জলনিমজ্জিত ব্যক্তির গাত্রে কম্বলাদি আচ্ছাদিত করিয়া দিবে ও রক্তের গতি নিয়মিত করিবার জন্য শরীর ও পদ ঘর্ষণ-করিতে থাকিবে।

গলায় জিনিস আট্‌কান।

দুর্ভাগ্য-বশতঃ বালকেরা যদি মটর বা মার্ব্বেল খাইয়া ফেলে ও তাহা গলায় আটকা-ইয়া যায়, তবে প্রথমতঃ, তাহার গলায় অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বমন করাইতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে ফললাভ না হইলে সন্নিকটবর্ত্তী কোনও ডাক্তারকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইবে।

যখন বেশ পড়িতে থাকে, তখন উক্ত ব্যাপার ধীরে ধীরে কমাইয়া, ক্রমে থামাইয়া দিতে হয়। এই প্রণালীতে উপকার না হইলে, অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণীয়।

হুল-ফুটা।

শরৎকালে বোল্‌তা ভীমরুল প্রভৃতি প্রায়ই দংশন করে। এরূপ স্থলে হুলটীকে নিষ্কাসিত করিয়া laudanum লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। হুল তুলিয়া লইয়া লবণ-দ্বারা ঘর্ষণ করিলেও যন্ত্রণা লোপ পায়।

দগ্ধ হওয়া।

দগ্ধ হইয়া যাইলে, স্থানটীর বস্ত্রাদি খুলিয়া দিয়া, রেড়ির তেল ও চূর্ণ ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া তাহার উপর তৎক্ষণাৎ লাগাইয়া দিবে। চর্ম্মের যে-সকল স্থানে বস্ত্রাদি লাগিয়া গিয়াছে তাহা ছাড়াইতে চেষ্টা করিও না।

(২) সোডা বাই-কার্ব্বের জলে ন্যাকড়া ডুবাইয়া দগ্ধ স্থানে বাঁধিয়া দিবে। ৮ হইতে ২৪ ঘণ্টা পরে ফোস্কাগুলি সূচ-দ্বারা গালিয়া দিয়া, তাহা বসাইয়া দিবে; কিন্তু ফোস্কা উঠা-ইতে চেষ্টা করিও না। পরে দগ্ধ স্থানটীতে ভেসিলিন লাগাইয়া দিবে।

চক্ষু ও কর্ণে বাহ্য বস্তুর প্রবেশ।

চক্ষে ধূলিকণা পতিত হইলে চক্ষু বুজিয়া থাকিলে অশ্রুগ্রন্থি হইতে জল নিঃসৃত হইয়া ধূলিকণা বা উত্তেজক পদার্থকে দূর করিয়া দেয়। যদি পতিত পদার্থ চক্ষে না দেখা যায়, তবে সামান্য রেড়ির তৈল চক্ষুতে দিয়া কিয়ৎ-কাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলে, যন্ত্রণার উপ-শম হয়। চক্ষে চূর্ণ পতিত হইলে ভয়ানক যন্ত্রণা হইয়া থাকে। তখন সির্কায় উত্তমরূপে জল মিশ্রিত করিয়া, তদ্দারা চক্ষু ধৌত করিয়া ফেলিবে। চূর্ণের কণাগুলি অপসারিত হইলে, সামান্য রেড়ির তৈল চক্ষে দিলে কষ্টের উপশম হইবে।

কর্ণে কোনও বস্তু প্রবেশ করিলে, যদি তাহা অঙ্গুলি-দ্বারা নাগাল না পাওয়া যায়, তবে সোন্না দ্বারা তাহা বাহির করিবে ; কিন্তু সাবধান, যেন কর্ণটক্কায় কোনরূপ আঘাত না লাগে। কারণ, আঘাতের ফল অতিভয়ানক।

কর্ণপ্রবিষ্ট বস্তু যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে ঈষদুষ্ণ জল কর্ণে প্রবেশ করাইয়া আহত কর্ণটী নীচের দিকে রাখিয়া উপরিস্থিত কর্ণকে চাপড়াইলেই কর্ণপ্রবিষ্ট বস্তু পড়িয়া যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

স্নেহের ব্যথা।

(গল্প)

(১)

করুণার মা মৃত্যুর সময় স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার করুণা যেন কখনও কষ্ট না পায়।" নরেন্দ্রবাবু পত্নীর শেষ অনুরোধটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া আসিয়াছিলেন। করুণা কখনও মাতার অভাব অনুভব করিতে পারে নাই। উপযুক্ত পাত্রে কন্যা-সমর্পণ করিয়া অল্পদিন পরেই যখন নরেন্দ্রবাবু পরলোক গমন করিলেন, তখন লোকে বলিল যে, কর্ত্তব্যপালনের জন্যই যেন নরেন্দ্রবাবু এতদিন বাঁচিয়া ছিলেন; তাই মুক্তি পাইবামাত্র তাঁহার উন্মুখ প্রাণ প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

করুণার স্বামী নূতন ডেপুটি হইয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিতে লাগিলেন। করুণা ছেলে-মানুষ, এখনও সংসার করিতে শিখে নাই; তাই সে বিধবা শাশুড়ীর কাছে রহিল। শাশুড়ীর মৃত্যু হওয়ায়, করুণার স্বামী তাহাকে নিজ কার্য্যস্থানে লইয়া গেলেন। ইহার পূর্ব্বে করুণা স্বামীকে ভাল করিয়া চিনিবার অবকাশ পায় নাই। যখন তাহার কল্পনার দেবতাকে সম্মুখে পাইয়া সে সবে পূজার আয়োজন আরম্ভ করিয়াছে, তখন নিষ্ঠুর বিধাতা তাহাকে সেটুকু হইতে বঞ্চিত করিলেন। পনের বছর বয়সে স্বামী হারাইয়া করুণা সংসার অন্ধকার দেখিল। কোথাও আশ্রয় দিবার মত কাহাকেও দেখিতে পাইল না। প্রতিবেশিনীদের মধ্যে অনেকে আসিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার অধিক কিছু দিবার সাধ্য তাঁহাদের ছিল না। একজন বলিলেন, "মা, তোমার আত্মীয়-স্বজনকে তোমার অবস্থা জানাও; এখানে বিদেশে একলা মেয়েমানুষ ত থাক্‌তে পার্‌বে না। ঠিকানা দিলে, আমাদের বাবু তোমার আপনার লোকের কাছে টেলিগ্রামও কর্‌তে পারেন।"

করুণা অনেক চিন্তা করিয়াও শ্বশুর কিংবা পিতৃকুলের কোনও নিকট আত্মীয়ের কথা স্মরণে আনিতে পারিল না! অবশেষে তাহার মনে হইল যে, তাহার এক মাতুল কলিকাতায় ব্যারিষ্টারী করেন। তিনি একটু অধিক সাহেবী-ভাবাপন্ন বলিয়া তাঁহার সহিত করুণাদের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল না। যাহা হউক, এমন বিপদের সময় করুণা তাঁহাকেই

পত্র লেখা স্থির করিল। তিন চারি দিন পরে পত্রের উত্তরে এক টেলিগ্রাম আসিল যে, করুণার মামাতো ভাই যতীন্দ্র তার পরদিনই তাহাকে লইয়া আসিবে! আশ্রয়-লাভের আশা সত্ত্বেও করুণা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। রক্তের সম্পর্ক থাকিলেও মাতুল অমরেন্দ্র তাহার নিকট একপ্রকার অপরিচিতই ছিলেন। নিতান্ত ছেলেবেলায় করুণা দুই-একবার তাঁহাকে দেখিয়াছিল। তারপর তাহার বিবাহের সময় তিনি একখানি বহুমূল্য বারাণসী শাড়ী উপহার পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু নিজে দেখা করিতে আসেন নাই; সহর ছাড়িয়া গেলে কাজের ক্ষতি হয়, এইকথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

যতীন্দ্র সেইবার বি, এ, পরীক্ষা দিয়া ছুটিতে বাড়ী বসিয়াছিল। সে গিয়া করুণাকে কলিকাতায় লইয়া আসিল। অমরেন্দ্রবাবুর বিশাল ভবনের এককোণে একটুখানি আশ্রয় পাইয়া করুণা বাঁচিল।

ঘোরতর বিষয়ী লোক বলিলে যাহা বুঝায়, মিষ্টার ও মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি, অর্থাৎ অমরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার পত্নী, তাহাই ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা করুণাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। হিন্দুবিধবা—যে সাতেও নাই পাঁচেও নাই, একমুঠা অন্নের পরিবর্ত্তে যে অন্নদাতা আত্মীয়ের সংসারে দাসীপনা করিতে প্রস্তুত,—তাহাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত না হইবারই কথা। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি, অবশ্য, করুণাকে কাজ করাইবার জন্য গৃহে আনেন নাই। তাঁহার দাসদাসীর অভাব ছিল না। করুণার জন্য তাঁহার অতিরিক্ত ব্যয়ের সম্ভাবনা ছিল না; কাজেই, তিনি মনে করিলেন যে, তাঁহার অল্প একটু দয়াতে যদি অনাথা ভাগিনেয়ীটি একটু নিঃশ্বাস ফেলিবার জায়গা পায়, তবে মন্দ কি? মাতুলগৃহে আসিয়া করুণা নিতান্ত সুখে না হউক, নিতান্ত দুঃখেও রহিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি একটু অধিক সাহেবীভাবাপন্ন ছিলেন। "সাহেব" না বলিয়া কেহ তাঁহাকে "বাবু" বলিলে তিনি বিলক্ষণ চটিতেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার পুরাদস্তুর সাহেবী রকম ছিল। কিন্তু গৃহিণীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে পূজা-পার্ব্বণে উৎসব-আমোদ-গুলি বাদ যাইতে পারিত না। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির এ-সব অনুষ্ঠানে কোনও আপত্তি ছিল না; কারণ, হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিবার সংকল্প, তাঁহার কোন কালেও ছিল না; তবে, তিনি একটু সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার অধিক বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বলিলেই, বোধ হয়, যথেষ্ট হইবে যে, তিনি Reformed Hindu দলের একজন নেতা ছিলেন।

এইসব সাহেবী ধরণ-ধারণের মধ্যে আসিয়া করুণা প্রথম প্রথম বড়ই অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল। সময় ও অভ্যাসের গুণে সবই সহিয়া যায়; করুণাও ইহাদের আচার-ব্যবহারে ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া গেল।

একটা কথা এতক্ষণ বলা হয় নাই। করুণা মুখে মামা, মামী ও দাদা বলিলেও এবাড়ীর লোকের প্রতি বিশেষ একটা প্রাণের টান সে অনুভব করে নাই। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির দশমবর্ষীয়া কন্যা মৃণালিনী বা মনু একমুহূর্ত্তেই তাহার হৃদয়খানি করায়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। মনুকে

ভালবাসিয়াই সে ক্রমে মামা, মামী, ও যতীন-দাদাকে আপনার জ্ঞান করিতে শিখিল। প্রথম দিন মন্টু একটু দূরে দূরে ছিল, কিন্তু দুইদিন যাইতে না যাইতেই সে এই নূতন দিদিটির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

(২)

করুণা ছেলেবেলা হইতেই একপ্রকার নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে। পিতা তাহাকে চক্ষের আড়াল করিতেন না, তাই সে কখনও অন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু পায় নাই। চিররুগ্না শাশুড়ীর কাছে থাকিতে, তাঁহার সেবা করিয়াই তাহার সব সময় কাটিয়া যাইত, পাড়ার সমবয়স্কা বৌঝিদের সঙ্গে বিশেষ ভাব করিবার সুযোগ ঘটে নাই। তাহার পর স্বামীর নিকট যে সামান্য কয় দিন ছিল, তখনও বাহিরের লোকের সহিত বড় একটা মিশিতে পায় নাই।

বাল্যকাল হইতে করুণা বড়ই ভক্তিমতী। যখন সে সম্মুখে সৌম্যমূর্ত্তি স্বামীকে দেখিল, তখন তাহার ভক্তিপ্রবণ চিত্ত তাঁহার পদে লুটাইয়া দিয়া সে কেবল পূজা করিতেই ব্যস্ত রহিল। স্বামীর প্রেমস্পর্শে তাহার প্রণয়-কোরকটী যখন সবে দলগুলি মেলিতে আরম্ভ করিয়াছে, বিধাতা ঠিক্ সেই সময়ে সেটিকে বৃন্তচ্যুত করিলেন। সন্তানের জননী হইলে, হয় ত, করুণার ভক্তিপ্রেমপূর্ণ চিত্তটি বাৎসল্য রসে আপ্লুত হইয়া পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিত, কিন্তু বিধির বিধানে তাহা ছিল না।

যাহাই হউক্, মন্টুকে পাইয়া করুণার হৃদয়ের সুপ্ত স্নেহরাশি জাগিয়া উঠিল। সে পূর্ব্বে কখনও কাহাকেও এত ভালবাসে নাই। এই স্নেহোচ্ছ্বাসের কোনও কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া সে একদিন মন্টুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি আর জন্মে আমার বোন্ ছিলি, মন্টু?" মন্টু একটু কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, "কেন, দিদি? এ জন্মেই ত আমি তোমার বোন্!" করুণা মনে মনে বলিল, "যদি মায়ের পেটের বোন্ হতিস্ রে, তবে তোকে কেউ দূরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করত না।"

করুণা কয়দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিল যে, তাহার মামা-মামী তাহার প্রতি মন্টুর এতটা টান পছন্দ করিতেছেন না; কারণ, মন্টু দিদির আদর্শে সাহেবীভাবের বিরোধী হইয়া পিতার শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে যাইতেছিল। তাই, তাঁহারা সুবিধা পাইলেই, কোনও ছুতায় মন্টুকে করুণার নিকট হইতে সরাইয়া লইতেন। এইজন্যই মন্টুর প্রতি আজ ঐ প্রশ্ন।

একদিন দুপুর-বেলা, করুণা নিজের ঘর-টিতে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিল, এমন সময় তাহার মামী আসিয়া তাহার পাশে বসিলেন। মামীর আগমনে সে একটু বিস্মিত হইল। কারণ, প্রয়োজন হইলে তিনি করুণাকে ডাকিয়া পাঠান, কখনও নিজে তাহার ঘরে আসেন না। বইখানা সরাইয়া রাখিয়া করুণা জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু দরকার আছে, মামী-মা?" মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "এই একটু গল্প করতে এলুম।" তাহার পর দুই চারি কথার পর বলিলেন, "দেখ, করুণা, তুমি আমাদের নিজের লোক, তোমাকে সব বলাই ভাল। ওঁর ইচ্ছে, মন্টুকে কোন বিলেত-ফেরতের হাতে দেন। ওর শিক্ষাদীক্ষাও সেইরকম ভাবেই দেওয়া হচ্ছে। এখন ও কিন্তু কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে! তোমাকে ও খুব

ভালবাসে, তা' ত জানই; সেইজন্যেই, বোধ হয়, পড়াশুনা গান-বাজনায় একটু অমনোযোগী হয়ে পড়েছে।"

করুণা ধীরে ধীরে বলিল, "আমি ত কখনও মঞ্জুকে পড়া, গান, এ-সব বন্ধ করতে বলি নি। তা-ছাড়া আমি নিজেই ত চাই যে, মঞ্জু ঐ সব বেশ করে শেখে। আমার জন্যে ওর এ-সব দিকে ক্ষতি হচ্ছে কেমন কোরে, বুঝতে পারলুম না ত মামী-মা?"

তাহার মামী তখন বলিলেন, "না, না, আমি ত বলি নি যে, তুমি বারণ করেছ। তবে মঞ্জু থেকে থেকে সব কাজকর্ম ফেলে এসে বলে, 'মা, দিদির কত কষ্ট! আমি ওর সঙ্গে গল্প করলে ও ভাল থাকবে; আমি যাই, একটু গল্প করি গে।' এই জন্যেই বলছিলুম যে, অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে।"

মঞ্জুর গভীর প্রীতির কথা শুনিয়া করুণার চোখে জল আসিল, সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "আমাকে কি করতে বলেন, মামী-মা?" মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "আমি বলছিলুম যে, তুমি ওর গল্পপ্রিয়তাকে প্রশ্রয় দিও না! ও তোমাকে এত ভালবাসে, তোমারও উচিত নিজের একটু স্বার্থ ত্যাগ কোরে ওর ভাল দেখা। তুমি বুঝিয়ে বল্লেই, মঞ্জু শুনবে, এই আমার বিশ্বাস। ওর সব খামখেয়ালী চলনে, উনি বড় বিরক্ত হন। এই দেখ না, আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই মেমেরা আসেন। সেইজন্যে উনি চান যে, মঞ্জু জুতা-মোজা পরে থাকে। পরশু কিনা সে একেবারে খালি-পায়ে মিসেস্ স্মিথের সামনে গিয়ে হাজির। উনি যখন বকলেন, তখন আবার বললে 'দিদি ত খালি পায়ে থাকে। এতে কি দোষ?'" এই সময় মঞ্জু সেই গৃহে প্রবেশ করিতেই তাহার জননী উঠিলেন।

করুণা মামীর সহানুভূতির অভাবে একটু আঘাত পাইলেও, মনে মনে একটু আনন্দ লাভ করিল যে, তিনি তাহাকে নিতান্ত পর মনে করেন না। জোর করিয়া মঞ্জুকে তাহার নিকট হইতে না সরাইয়া, তিনি যে তাহার সহিত মন খুলিয়া সে-বিষয় কথা বলিলেন, ইহাতে সে অনেকটা আরাম অনুভব করিল। সে মঞ্জুকে কাছে বসাইয়া বলিল, "মঞ্জু, তুমি আমার সব কথা শুনবে?" মঞ্জু উৎসাহপূর্ব্বক সম্মতি জানাইল। করুণা বলিল, "তুমি আজকাল দুষ্টু মেয়ে হয়ে যাচ্ছ, কেন বল দেখি? মামীমা বলছিলেন, তুমি মন দিয়ে পড়া-শুনা কর না!" মঞ্জু করুণার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, "তোমাকে ছেড়ে মন লাগে না যে দিদি! বাবাকে বোলে আমার পড়ার সময় তোমাকে সেই ঘরে বসিয়ে রাখ্‌ব, তা হ'লে পড়া হবে।" করুণা হাসিয়া বলিল, "দূর পাগ্‌লী। আমাকে দেখে তোমার মেম শিক্ষয়িত্রী ভাব্‌বেন এ একটা জন্তু না কি! আমি কি তাঁর সাম্‌নে বেরোতে পারি ভাই!" মঞ্জু সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ইস্ মিসেস্ রো কখ্‌খনো কিছু মনে করবেন না।" করুণা সে কথা চাপা দিয়া বলিল, "মঞ্জু, লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার, তোমার বাবা-মা যা বলেন, তাই শুনে চলো। তাঁদের অসন্তুষ্ট করো না। তুমি ভাল মেয়ে হোলে আমার কত আনন্দ হবে, বল দেখি! মঞ্জু সংক্ষেপে "আচ্ছা" বলিয়া করুণার চুল ঘাঁটিতে লাগিল। মঞ্জুকে কাছে পাইলে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না; কিন্তু পাছে মামী বিরক্ত হন,

তাই করুণা বলিল, "এবার তুমি যাও, আমার অন্য কাজ আছে।" মন্টু বলিল, "তোমার আবার কি কাজ? আমাকে তাড়াবার ফন্দি, না?" করুণা হার মানিয়া চুপ করিল।

(৩)

মন্টু আজকাল বাপ-মায়ের কথামত সব করে। করুণার দেখাদেখি সে মাছ-মাংস খাওয়া ছাড়িয়াছিল, কিন্তু তাহারই অনুরোধে সে আবার তাহা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রথম প্রথম করুণার সময় কিছুতেই কাটিতে চাহিত না। যে সময়টুকু মন্টু গান-বাজনা, পড়াশুনা বা চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি লইয়া থাকে, করুণা ততক্ষণ কি করিবে ভাবিয়া পায় না। একদিন সে মামীকে বলিল, "মামীমা, শুধু বসে বসে আমার ভাল লাগে না। ভাঁড়ার দেওয়া, খাবার জোগাড় করা, এ-সব চাকরদের হাতে না দিয়ে, আমাকে দিলে ভাল হয়। আপ্‌নাদের কি তাতে কোন আপত্তি আছে?" মিসেস্ চাটার্জ্জি বলিলেন, "না, আপত্তি আবার কি? তুমি কর্‌লে ত ভালই হয়।" সেই দিন হইতে করুণা যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

একদিন মন্টু আসিয়া বলিল, "দিদি, আমি তোমার কাছে ঘরসংসারের কাজ শিখ্‌বো।" করুণা তাহার গাল ধরিয়া বলিল, "তোকে এ-সব কর্‌তে হবে না। তোর যে একজন মস্ত সাহেবের সঙ্গে বিয়ে হবে। তার বাড়ীতে কাজ কর্‌বার ঢের লোক থাক্‌বে।" মন্টু রাগ করিয়া বলিল, "আমার বিয়েই হবে না, তা আবার সাহেব!" করুণা হাসিয়া বলিল, "তোর যে তের বছর বয়স হয়েছে, কে বল্‌বে? প্রথম দিন যেমন ছেলে-মানুষটি দেখেছিলুম, আজও তেমনিটিই আছিস্। তোর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল, জানিস্!" মন্টু বলিল, "তা হোক্। আমার হবে না। বাবা বলেছেন যে, আমার পছন্দমত আমার বিয়ে হবে। তা আমার কিছুতেই কাউকে পছন্দ হবে না।" করুণা বলিল, "আমাদের গুণবতী রাজকন্যার যোগ্যবর, বুঝি, এ ভূভারতে মিল্‌বে না?" মন্টু তাহার আরক্ত মুখ ফিরাইয়া বলিল, "যাও,—তাই বুঝি!" তাহার পর হঠাৎ একনিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "আমি তোমায় ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী যেতে পার্‌ব্বো না। তুমি যদি সঙ্গে যাও ত বিয়ে কোর্‌ব্বো।" করুণা ছল্‌ছল্ চোখে মন্টুর পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল, "ছিঃ, তা কি হয়? মামা থাক্‌তে আমি অন্য জায়গায় যেতে পারি কি? উপায় থাক্‌তে কে আবার পরের গলগ্রহ হয়?" মন্টু অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আমি তোমার পর, না?" করুণা সস্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিল, "ভগিনীপতিটি ত পর। তিনি ত আর তোমার খাতিরে আমায় ভালবাস্‌বেন না।" মন্টু বলিল, "তবে আমি বিয়েই কোর্‌ব্বো না।" করুণা বলিল, "মেয়ে মানুষের কি বিয়ে না কর্‌লে চলে, পাগ্‌লী?" মন্টু বলিল, "আচ্ছা সে কথা থাক্। একটা গল্প বল না, দিদি!"

এই বলিয়া করুণার কোলে মাথা রাখিয়া সে শুইয়া পড়িল। তারপর করুণার একগুচ্ছ চুল সাম্‌নে টানিয়া আনিয়া বলিল, "দিদি, তোমার কি সুন্দর চুল! এমন আমি-কোথাও দেখি নি। এই চুল তুমি কাট্‌তে চাচ্ছিলে! কি দুষ্টু! কখ্‌খন কাট্‌তে পাবে না। এখন

একটী গল্প বল।" করুণা হাসিয়া বলিল, "যা হুকুম।" তারপর সে সাবিত্রীর উপাখ্যান বলিতে লাগিল।

করুণার গল্প বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাহার মুখের ভাবে, কণ্ঠস্বরে, শ্রোতাকে সে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারিত। সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া যখন সে পৌরাণিক কাহিনীগুলি মন্টুকে শোনাইত, তখন মন্টুর মনে হইত, সে যেন প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাহারই বর্ণনা করিতেছে! মন্টু শুনিতে শুনিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "দিদি, তুমি ত ঠিক্ সাবিত্রীর মত সতী; তুমি কেন তোমার স্বামীকে যমের কাছ থেকে ফিরিয়ে আন্‌লে না?" করুণা মন্টুকে বুকে চাপিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ছি মন্টু, ও কথা বলো না। তাঁদের দেবতার অংশে জন্ম ছিল। তাঁরা যা পার্‌তেন, আমরা পাপী মানুষ কি তাই পারি, বোন্!" মন্টুর চোখেও জল আসিয়াছিল; সে করুণাকে জড়াইয়া বলিল, "দিদি, তুমি পাপী ত, পুণ্যবতী কে?"

(৪)

করুণার হৃদয়ের প্রায় সবটুকু স্নেহ-ভালবাসা, মন্টু একাই দখল করিয়া বসিয়াছিল। তাহার মনে হইত, মন্টুর মত সুন্দর, বুঝি, বিধাতা আর কিছুই গড়েন নাই। মন্টু বড় হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্রই তাহার বিবাহ হইবে, এ-কথা মনে করিয়া করুণা কষ্ট অনুভব করিত। তখনই আবার লজ্জিত হইয়া মনে করিত, "ছিঃ, আমি কি স্বার্থপর!" মন্টু তাহার বুকের প্রত্যেক রক্তবিন্দুর সহিত যেন মিশাইয়াছিল; তাই তাহাকে ছাড়িবার কথা মনে হইলে, করুণার বুক ফাটিয়া যাইত।

এই সময় একদিন মন্টুর দূর-সম্পর্কের মামাতো ভাই সতীশবাবু, সপরিবারে আসিয়া মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির বাড়ীতে অতিথি হইলেন। তাঁহারা দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; সমস্ত পশ্চিমটা একবার ঘুরিয়া আসিবেন। তাঁহারা মন্টুকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন। মন্টুর পিতা-মাতা সানন্দে অনুমতি দিলেন। করুণাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া মন্টু দুই একবার "না" বলিয়াছিল, কিন্তু নূতন দেশ দেখিবার আকাঙ্ক্ষাই শেষে জয়ী হইল। মন্টু তাঁহাদের সহিত চলিয়া গেল। বিদায়ের দিন করুণা কিছুতেই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না।

তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া সতীশবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "মা গো, এ আবার কি? মায়ের চেয়েও দেখি যে, এঁর টান বেশী! একমাস মন্টুকে ছেড়ে ওঁর প্রাণ বেরিয়ে যাবে আর কি!" করুণা এই কথা শুনিয়া দুইহস্তে বক্ষ চাপিয়া নিজের ঘরে গিয়া লুটাইয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাপেক্ষা আঘাত লাগিল যে, মন্টু এত সহজেই চলিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, আহা, ছেলেমানুষ! তাহার কি কোন সাধ থাক্‌বে না! করুণার যেন সংসারে মন্টু ছাড়া কোন আনন্দ নাই, তাই বলিয়া মন্টুও কি সব সুখ ছাড়িয়া তাহারই কাছে পড়িয়া থাকিবে?

মন্টু প্রায় রোজই করুণাকে পত্র লিখিত। করুণা সেগুলি সযত্নে তুলিয়া রাখিত; দিনে শতবার করিয়া সেগুলি পড়িত। দেখিতে দেখিতে একমাস হইয়া গেল। সতীশবাবু লিখিলেন যে, তাঁহার ছোট ছেলেটিকে আর কিছুদিন পশ্চিমে রাখিতে পারিলে তাহার শরীরের পক্ষে বড়ই ভাল হয়,—তাই তাঁহারা

তিনমাসের জন্ত একটা বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন ; তিন মাস পরে কলিকাতায় ফিরিবেন। মঞ্জুও তাঁহাদের সঙ্গে থাকে, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি সম্মতি জানাইয়া পত্রের উত্তর দিলেন। করুণা একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া দিন গণিতে লাগিল। করুণা ভাবিল, তিনমাসেই এত কষ্ট! মঞ্জুর বিবাহ হইয়া গেলে সে কেমন করিয়া বাঁচিবে!

বাস্তবিকই দিন যেন আর কাটে না! তাহার উপর মঞ্জু আজকাল পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছে। করুণা ভাবিল, এইবার অভিমান করিয়া একখানা পত্র লিখিবে ; কিন্তু তাহার পর মনে হইল, সেখানে বেড়াইতেই সময় কাটিয়া যায়, তাই বোধ হয়, মঞ্জু পত্র লিখিতে বেশী সময় পায় না।

তিন মাস পরে যে-দিন মঞ্জুদের আগমন-বার্ত্তা বহন করিয়া একখানি পত্র আসিল, সে-দিন আনন্দে করুণার সব কাজেই ভুল হইতে লাগিল। তাহার পর যখন একখানা গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে থামিল, এবং মঞ্জুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তখন করুণার দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। স্বাস্থ্যের প্রভায় মঞ্জুর স্বভাবসুন্দর মুখখানি দীপ্ত দেখাইতেছিল। করুণার ইচ্ছা করিতেছিল, শতচুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অত লোকের সামনে তা কি করা যায়? তাই এই তিন মাসের সঞ্চিত আদরটুকু লইয়া করুণা মঞ্জুকে নিজের ঘরে পাইবার অপেক্ষায় রহিল।

কেবল তিন মাস,—তার মধ্যেই এত পরিবর্ত্তন! করুণা দেখিল, মঞ্জু আর তেমন ভাবে তার সঙ্গে মেশে না। মঞ্জু সব সময়ই প্রায় সতীশবাবুর স্ত্রীর কাছে থাকিত। করুণা বুঝিতে পারিল না, কি অপরাধে মঞ্জু এমন পর-পর ব্যবহার করে! করুণা জানিত না যে, সতীশবাবুর স্ত্রী এই অল্প সময়ের মধ্যেই মঞ্জুকে বুঝাইয়াছেন যে, করুণার ভালবাসা কেবল স্বার্থ-প্রণোদিত,—ভবিষ্যতে মঞ্জুর ঘাড়ে চাপিবার ভূমিকা-স্বরূপ। মঞ্জু একবার বলিয়াছিল, "না বৌদিদি, তা কি হয়?" তাহার এই ক্ষীণ প্রতিবাদটি সতীশবাবুর স্ত্রীর অবজ্ঞার হাসির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। অন্য কেহ হইলে, হয় ত, এত সহজে ভুলিত না, কিন্তু মঞ্জুর প্রকৃতি চিরকালই খামখেয়ালী, তাই তাহার মনে কোন ভাবই গভীরভাবে দাগ দিতে পারিত না। করুণার প্রতি তাহার ভালবাসার উচ্ছ্বাস জোয়ারের জলের মত আসিয়াছিল, কাজেই তাহাতে আবার শীঘ্রই ভাঁটা ধরিয়া গেল।

সতীশবাবুর একটি শ্যালক সেই বৎসর ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিল। সতীশবাবুর স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা, ধনী পিতার একমাত্র কন্যা মঞ্জুর সহিত তাহার বিবাহ হয়। কলিকাতা পরিত্যাগের পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার এই অভিপ্রায় মঞ্জুর মাতাপিতাকে জানাইলেন। মিষ্টার ও মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি আগ্রহের সহিত সম্মতি জানাইলেন ; কারণ, তাঁহারা জানিতেন যে, 'ভাল ছেলে' বলিয়া সতীশবাবুর শ্যালক সুবোধের বেশ সুনাম আছে। বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই তাহার বুদ্ধি, চরিত্র ও লেখাপড়ার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল ; বিলাত হইতে সে খ্যাতি মলিন না হইয়া, উজ্জ্বলতরই হইয়াছে। তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, সুবোধকে জামাতৃরূপে পাইবার জন্য, অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত বিলাত-ফেরত পিতাই উন্মুখ

হইয়া আছেন। বিধাতা এমন রত্নটি অযাচিত ভাবে তাঁহাদের দান করিতেছেন, দেখিয়া তাঁহারা পুলকিত হইলেন।

মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "সুবোধকে বাড়ীতে এনে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া যাক্। সে এসে মেয়ে দেখুক্; তারও ত একটা মতামত আছে।" সতীশবাবুর স্ত্রী মঞ্জুর মাকে বলিলেন, "মঞ্জুকে দেখে তার আর মত না হয়ে যায় না। অমন মেয়ে সে আর পাবে কোথায়?" কন্যার প্রশংসা শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত-চিত্তে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "বৌমা, তুমি দিন কয়েক থেকে যাও। তুমি থাক্‌তে থাক্‌তেই সুবোধ এলে, শীগ্রিই তার লজ্জা ভেঙে যাবে।"

করুণা সকলই শুনিল। সুপাত্রের সহিত মঞ্জুর বিবাহের আয়োজনে তাহার খুব আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কি জানি কেন, তাহার মনের এককোণে একটু ব্যথা লুকাইয়া রহিল।

সুবোধের সম্পূর্ণ মত জানিয়া মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি সেই মাসের শেষেই মঞ্জুর বিবাহ দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বিবাহের পূর্ব্বে সুবোধ এক্-এক-দিন দেখা করিতে আসিত। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি করুণার সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু করুণা রাজি হয় নাই। সে আড়াল হইতে সুবোধের স্মিত-সুন্দর মুখখানি দেখিয়া মনে মনে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া বলিত, "মঞ্জু যেন সুখী হয়।" একদিন সে মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করিল, "মঞ্জু, বর দেখেছিস্ ত? কেমন? পছন্দ হয়?" মঞ্জু, "যাও" বলিয়া পলাইয়া গেল। মঞ্জুর সলজ্জ অথচ আনন্দপূর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া করুণা বুঝিল যে, মঞ্জু সুবোধের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরের চরণে উভয়ের কল্যাণকামনা করিয়া সে কার্য্যান্তরে গেল।

(৫)

বিবাহের আর দুই দিন বাকী। কাজের গোলমালে করুণা একরকম আছে। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা তাহার বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। আর দুই দিন পরে মঞ্জু চলিয়া যাইবে। সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও কি তাহাকে আঁক্‌ড়াইয়া রাখিবার অধিকার করুণা পায় না? করুণা ঘরের ভিতর গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর আপনার স্বার্থপর ভালবাসার জন্য নিজেকে শতবার ধিক্কার দিল, কিন্তু তবুও যে মন মানে না! করুণা স্বামীর ছবিখানি বাহির করিল। অশ্রুজলে ভাল করিয়া স্বামীর মুখ দেখিতে পাইল না। তাহার মনে হইল, মঞ্জুকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়া সে বুঝি, স্বামীকেও ভুলিতে বসিয়াছে। সে তাঁহাকে গভীর ভক্তি দিয়াছিল বটে, তবে এমন করিয়া বুঝি, তাঁহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই! চোখের জল মুছিয়া ছবিখানা মাথায় ঠেকাইয়া করুণা আপন মনে বলিল, "ওগো, দাসীকে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে যাও। আমি যে এখানে থাক্‌তে পারি না। কেমন কোরে আমি সব ছেড়ে বেঁচে থাক্‌ব?" আবার তাহার দু'চোখ হ'তে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। এই সময়ে সতীশবাবুর স্ত্রী তথায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি করুণার ঘরে ঢুকিয়া, তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া বাহির হইয়া গেলেন; মঞ্জুর কাছে গিয়া বলিলেন, "তোমার দিদি না, তোমায় বড় ভালবাসে! এই শুভকর্ম্মের

সময় কি-না, ঘরের কোণে বসে চোখের জল ফেলা হচ্ছে! আসলে, তোমার এত ভাল বিয়ে হচ্ছে, তাই সহ্য হচ্ছে না।" মন্থু মাথা নীচু করিয়া রহিল, কোনও উত্তর করিল না।

যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেলে মন্থু শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল। কিছুদিন পরেই মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি কন্যাজামাতাকে আবার লইয়া আসিলেন। যে কয়দিন মন্থু ছিল না, করুণা সে কয়দিন অত্যন্ত কষ্টে কাটাইয়াছিল। প্রথম প্রথম ত একেবারে ঘুমাইতে পারিত না; বিছানায় মুখ গুঁজিয়া ডাকিত, "মন্থু, মন্থু আমার! আমাকে তোর কাছে নিয়ে যা। আমার অত মান-অপমান দিয়ে কি হবে? আমি তোকে ছেড়ে থাকৃতে পারি না যে!" নিজের এই ভালবাসার আবেগ দেখিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইয়া যাইত। প্রণয়ীদের মধ্যেই ত এমন ভালবাসার কথা উপন্যাসে পড়া যায়! মন্থুকে সে কেন এমন ভালবাসে? প্রতিদিন ঠাকুরের কাছে করুণা প্রার্থনা করিত, "হরি, আমায় শান্তি দাও।"

এবার সুবোধের সহিত করুণার আলাপ হইল। তবে করুণা তাহার সহিত বড় একটা কথা বলিত না। একদিন সুবোধ মন্থুকে বলিল, "মৃণাল, তোমার দিদিকে ডাক না, একটু গল্প করা যাকৃ। তোমার দিদিকে আমার বড় ভাল লাগে। দেখ্‌লেই মনে হয় যেন একখানি দেবীপ্রতিমা।" মন্থু, বোধ হয়, কথাটা শুনিয়া একটু বিরক্ত হইল; বলিল, "এখন আর ডাকতে পারি না। সে হয় ত, কাজ করছে।" এই সময় করুণা তাহাদের ঘরের সামনে দিয়া যাইতেছিল দেখিয়া, সুবোধ দরজার কাছে আসিয়া ডাকিল, "দিদি, একটু থামুন না; মৃণাল আপনাকে ডাকছে।"

করুণার মাথার কাপড় পড়িয়া গিয়াছিল; তাহার অযত্নবর্দ্ধিত জটাবদ্ধ উন্মুক্ত কেশরাশি পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; সত্য-সত্যই তাহাকে একখানি দেবীপ্রতিমার ন্যায়ই দেখাইতেছিল। সে সুবোধকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া দিল।

সুবোধ এত বড় হইয়াও স্বভাবের সরলতা হারায় নাই; সে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "দিদি, আপনার কি সুন্দর চুল; ঠিক জগদ্ধাত্রীর মতন।" করুণা লজ্জিত হইয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। সুবোধের আহ্বানে ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডেকেছ মন্থু?" মন্থু মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি ডাকি নি। উনি মিথ্যা কথা বলেছেন।" সুবোধ হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহাতেও মন্থুর মুখের অপ্রসন্নতা দূর হইল না দেখিয়া, "আমার একটু কাজ আছে, সেরে আসি," বলিয়া করুণা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। বাহির হইতে সে শুনিতে পাইল, মন্থু সুবোধকে বলিতেছে, "তুমি বিধবাদের চুল রাখা পছন্দ কর? আমি ত দু'চক্ষে ও-সব দেখ্‌তে পারি না;—তা আবার লোক-দেখানর জন্যে খুলে বেড়ান!"

করুণার বক্ষের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হইল; সে কোনমতে আপনাকে সাম্‌লাইয়া চলিয়া গেল! সুবোধ যে বলিল, "ছিঃ, মৃণাল, তোমার দিদি দেবী, তাঁর বিষয় অমনি করে বলা উচিত নয়।" এবং তাহার উত্তরে মন্থু যে বলিল, "আমি এতদিনে যা না চিনতে পেরেছি, তুমি দেখ্‌ছি দু'দিনে তাই

চিনে ফেলেছ।” এসব কথা আর করুণার কানে পৌঁছিল না। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। সে নিজের ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার চোখে জলও আসিল না। সতীশবাবুর স্ত্রীর শত গঞ্জনা সে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু মন্থ! যে মন্থু তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না বলিয়া বিবাহ করিতেও অসম্মত ছিল, সে কেমন করিয়া এমন হইল! অতীতের স্মৃতিগুলি একে একে করুণার মনে পড়িতে লাগিল। মন্থুই তাহাকে চুল কাটিতে দিবে না বলিয়াছিল! মন্থু ভালবাসিত বলিয়াই না চুলের প্রতি তাহার মায়া! সেই মন্থু অমন করিয়া বলিল! করুণা বুঝিতে পারিল না, মানুষের এতখানি পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া হয়। বাক্স হইতে কাঁচিখানি বাহির করিয়া সে তাহার আগুল্‌ফলম্বিত তরঙ্গায়িত কেশরাশি কাটিয়া ফেলিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, “মন্থু, মন্থু!” বলিতে বলিতে দুই বিন্দু অশ্রুও গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া, স্বামীর উদ্দেশে ভক্তি-অবনত-চিত্তে মাথাটি নত করিল।

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি করুণাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও কি করুণা, তুমি চুল কাট্‌লে কেন?” করুণা মৃদু হাসিয়া বলিল, “অনেক দিন থেকেই কাট্‌ব কাট্‌ব ভাবছি মামীমা! যে গরম পড়েছে, আর সহ্য হয় না। কি বা হবে চুল দিয়ে!” মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি আর কিছু বলিলেন না।

সে-দিন রাত্রে যখন করুণা মন্থুকে খাইতে ডাকিতে গেল, তখন তাহার মুখে বিষাদের শেষ রেখাটি পর্য্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে। সে মন্থুর আশ্চর্য্যভাব কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া অত্যন্ত সহজ শান্ত স্বরে ডাকিল, “মন্থু, খাবে এস।”

এতদিন পরে ঠাকুর করুণার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। তাহার স্নেহোচ্ছ্বাসপূর্ণ ব্যথিত হৃদয়খানি দেবতার করুণায় আজ শান্তিলাভ করিয়াছে!

শ্রীরথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১২)

নমিতা বিস্ময়ে স্তব্ধ থাকিলেও কৌতূহলী সুশীলের আগ্রহ অসংবরণীয়। সুতরাং, তাহার রসনা দ্রুততালে সশব্দে সঞ্চালিত হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। “পত্র কে লিখিয়াছেন? কেন লিখিয়াছেন? কি প্রয়োজন?” সুশীলের ইত্যাকার প্রশ্নের উপর্য্যুপরি বর্ষণে বিব্রত হইয়া, নমিতা ক্ষিপ্র-হস্তে খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া পড়িল। মাত্র চারি ছত্রে সমাপ্ত ক্ষুদ্র অনুরোধ-লিপি:—

“মাননীয়াসু,

বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া আপনার

কাছে উপদ্রব করিতে অগ্রসর হইয়াছি। সহৃদয়তা-গুণে ক্ষমা করিবেন। আপনার সুবিধা-মত যে-কোনও সময়ে একবার এ বাটীতে আসিয়া পায়ের ধূলা দিলে, বড়ই উপকৃতা হইব। ইতি—

নির্ম্মলবাবুর ভ্রাতৃজায়া—

শ্রীসরমা মিত্র।”

চমৎকৃতা নমিতা হতবুদ্ধি হইয়া গেল!—সরমা মিত্র!—নিশ্চয়ই ইনি ডাক্তার প্রমথ মিত্রের স্ত্রী!

ব্যগ্র ঔৎসুক্যে অধীর সুশীল, নমিতার এ-পাশ হইতে ও-পাশ হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া, পত্রখানার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া, অবশেষে ডাকিল, “দিদি!”

পত্রের প্রতি স্থির-নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া চিন্তামগ্না নমিতা অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল! পরক্ষণেই হাতের চিঠিখানা টেবিলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া, অস্বাভাবিক অপ্রসন্নতার সহিত রুক্ষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “ঢের বেলা হয়েছে; আর বাজে এক মিনিটও সময় নষ্ট করা নয়। শীগ্‌গী তেল নিয়ে আয়, মাখিয়ে দেব।” সুশীলের মুখ ম্লান হইয়া গেল। গতিক ভাল নয় বুঝিয়া, বিনা-বাক্যে সে দিদির আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল। দিদির প্রতীক্ষায় এখনও সে স্নান করে নাই।

চঞ্চল চরণে কক্ষমধ্যে এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিতে ঘুরিতে উন্মনা নমিতা চিন্তাকুল বদনে, ঘর্ম্মাক্ত পরিচ্ছদ খুলিতে লাগিল। তাহার পর টেবিলের কাছে সরিয়া আসিয়া, পরিত্যক্ত পত্রখানার প্রতি অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

পত্রখানা, ক্ষুদ্র পত্র। কিন্তু নমিতার মনের উপর এটা যে আশ্চর্য্য প্রহেলিকার তীব্র ঝাপ্টা হানিয়াছে! উপর-ওয়ালার স্ত্রীর আহ্বান! “বিশেষ প্রয়োজন”—ইহার অর্থ কি? নমিতার পক্ষে ইহা যে বড় বিষম অদ্ভুত ঠেকিতেছে! এ ভাষা যতই মর্জ্জিত ও কোমল হউক্, কিন্তু কে জানে, ইহার অভ্যন্তরে কোন্ জটিলতা অবস্থান করিতেছে! এ ‘প্রয়োজনের’ উদ্দেশ্য কি? ইহা অনুগ্রহের লাঞ্ছনা, না, দম্ভের পরিহাস?

নমিতার মস্তকের রক্তস্রোত ঝিম্ ঝিম্-শব্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল;—একসঙ্গে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা-স্মৃতি চিত্তপটে উদিত হইল; ডাক্তার মিত্রের আচার-ব্যবহারের সুতিক্ত প্রত্যক্ষ বিবরণের চৌহদ্দীগুলা, স্মৃতির দ্বারে উচ্চকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল!—চিত্ত সবেগে বক্র হইয়া উঠিল; অস্থির-ভাবে নমিতা কক্ষের বাহিরে চলিয়া আসিল।

অন্য দিনের অপেক্ষা বেশী শীঘ্র ও সংক্ষেপে পীড়িত বালকের তত্ত্ব সুধাইয়া, স্নানাহার শেষ করিয়া নমিতা শয়ন কক্ষে আসিল। পত্রখানা তখনও করুণ অনুনয়ের অক্ষরমালা বুকে করিয়া নিস্পন্দভাবে টেবিলের উপর পড়িয়াছিল; নমিতা বিরক্তভাবে তৎ-প্রতি চাহিয়া মুখ ফিরাইল। খোলা জানালার রৌদ্রের সন্নিধানে চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া সে সেই চিকিৎসা-পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিল। আর্দ্র কেশরাশি আধ-ঘণ্টার মধ্যে রৌদ্রে শুখাইয়া লইতে হইবে; তাহার পর ঘণ্টাখানেক ঘুমাইয়া, রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া ‘ডিউটী’ খাটার দায়ে নিশ্চিন্ত হইবে।

নমিতা বই পড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু পাঠ্য-বিষয়ে তাহার চিত্ত আদৌ নিবদ্ধ হইল

না। মনের কোণটায় কি যেন একটা অস্পষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্যের বেদনা ক্রমাগতই খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। পৃথিবীর সকলের সহিতই চিরদিন সে সরল বিশ্বাসে সখ্য-সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া চলিয়াছে। এখন দিনে দিনে তাহার সুস্থ সরলতার সুদৃঢ় বুকে, উদ্দাম বেদনার ক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে, দুঃখের ভঙ্গ ধরিয়াছে,—এখন পরিচিত অপরিচিত, সকলের পানেই হঠাৎ বিশ্বাসের দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতে তাহার শঙ্কা হয়, সন্দেহ হয়;—মনের মধ্যে রুদ্ধ ব্যাকুলতা অজ্ঞাত উদ্বেগে হাঁপাইয়া উঠে! ...এ বড় অস্বস্তিকর ক্লেশ!

চুলটা আধ্-শুক্‌না হইবার পূর্ব্বেই নমিতা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, শয্যায় পড়িয়া চক্ষু বুজিল; কিন্তু চক্ষু বোজানই সার হইল মাত্র; ঘুম হইল না। মনের প্রচণ্ড বিক্ষোভ চতুর্গুণ ফেনাইয়া, তাহার বাহ্য-প্রকৃতিকে অতিমাত্রায় চঞ্চল করিয়া তুলিল। ঘুমের চেষ্টা ব্যর্থ বুঝিয়া, নমিতা গা-ঝাড়া দিল। কক্ষমধ্যে বার-কয়েক পায়চারি করিয়া, অন্যমনস্কভাবে টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ও পত্রখানা তুলিয়া লইয়া উদাস দৃষ্টিতে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

সরমা মিত্র,—অর্থাৎ ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী! তা হউক্; তবু ত তিনি নির্ম্মলবাবুর ভ্রাতৃজায়া! আশ্চর্য্য রহস্য! সেই শিশুর মত সরল-স্নেহ-শ্রীমণ্ডিত সুন্দর যুবকের ইনি সম্মানস্থানীয়া সম্পর্কীয়া রমণী!

অজ্ঞাত কৌতূহলে ধীরে ধীরে নমিতার মন আগ্রহোন্মুখ হইয়া উঠিল!......ইনি ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী! কিন্তু শুধু সেই সম্পর্কটিকে 'বড়' করিয়া, ইঁহার অজ্ঞাত 'প্রয়োজন'টাকে সন্দিগ্ধ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে যথেচ্ছভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না। কে বলিতে পারে, ইঁহার মধ্যে স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্ব নাই? কে জানে, ইনি সংসারের নিকট 'কায়ার ছায়া'-রূপে প্রতিপন্ন হইলেও, ভিন্ন-ধাতু-গঠিতা জীবন্ত-প্রাণ-বিশিষ্টা রমণী নহেন? কে জানে, ইনি কি শুধু সদা-বিক্ষিপ্ত-চেতা ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী—কি সরলস্বভাব প্রিয়দর্শন ভদ্রলোক নির্ম্মলবাবুর ভ্রাতৃজায়া ও বটেন!

দূর হউক্, অবস্থা-চক্রের উৎপীড়নে নিজের দুঃখ-দ্বন্দ্বের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, নমিতা মূর্খ দৌর্ব্বল্যে এমন শিষ্ট সংযত প্রীতির আহ্বানকে কঠিন ভ্রূভঙ্গীতে উপেক্ষা করিয়া, শুষ্ক রূঢ়তার আশ্রয়ে আত্ম-মর্য্যাদার নামে আত্ম শ্লাঘার আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়া ছলনা করিবে না! হউক্ অসম্মান; ইনি যাহা ভাবিয়া যে উদ্দেশ্যেই ডাকিয়া থাকুন, নমিতা কেন কর্ত্তব্য অবহেলা করিবে? বাহ্যিক অস্বাচ্ছন্দ্যের ভয়ে সে কেন অনর্থক অভ্যন্তরটা তীব্র অস্বস্তির বিষ-বাষ্পে ভরাট করিয়া তুলিতেছে? এ কি মতিচ্ছন্ন!

অসময়ে সদ্যঃ-স্কুল-প্রত্যাগতা সমিতা আনন্দোৎফুল্ল-বদনে কক্ষে ঢুকিয়া উৎসাহ-মুখর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"দিদি, ভাই, আজ আমাদের এগ্‌জামিনের খবর বেরুলো; আমি এবার ফার্ষ্ট হয়ে ক্লাশে উঠেছি!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 651. — November, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫১ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩২৪। নবেম্বর, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে, আয় এসেছে তরী!
এ পারে ফুরাল খেলা, আর তবে কেন বেলা?
বেলা হ'লে হবে যে রে তুফান ভারি;
যাবি যদি চলে আয় এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে, আয় এসেছে তরী;
এ পারে কেবলি শোকে পাগল করিবে তোকে;
কেঁদে কেঁদে চোখে আর রবে না বারি;
এই বেলা চলে আয়, কেন রে দেরি!

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী;
আশার কুহকে মাতি ছুটাছুটি দিবারাতি,
তবু আশা পুরিবে না জীবন ধরি!
কাজ নাই, চলে আয় তাহারে ছাড়ি!

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী!
মায়ার বাঁধন কাটি তরীতে চলরে ছুটি,
ও-পারে পাবি রে সুখ পরাণ ভরি;—
পারে নিয়ে যাবে বলে এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী!
পাপী তাপী যে যথায় সকলে ছুটিয়া আয়,
এ তরীতে নাহি ভয় তুফানে পড়ি,—
এ যে সেই পরমেশ-চরণ-তরী!

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ শেঠ।

গানের স্বরলিপি।

ঝিঁঝিট মিশ্র—একতালা।

তুমি এস হে।
মম বিজন চির-গোপন
দুঃখ-বিতান হৃদি-আসনে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
জাগে চেতনা শত বেদনা,
মৃত জীবনে তব পরশে ;
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
লভি শকতি, প্রেম-ভকতি,
তব আরতি করি জীবনে ;
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
আমি তৃষিত, আছি ক্ষুধিত,
যাচি অমৃত তব সকাশে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
যত সাধনা, ব্রত-কামনা,
সব সফল তব সাধনে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ১
II র্সর্স র্রা পা। ধা ধা -া। পা ধা পা। পধা পা -া I
(১) তু ০ মি এ স ০ হে ০ ০ ০০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I ধা পা -া। মা গা -া। রগা মা -া। -া গা রা I
(২) তু মি ০ এ স ০ হে০ ০০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা রা -া। সা ন্া -া। ধ্া ন্া স্া। -া -া -া II
(৩) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
II সা ঋা -া। সঋগা পমগা -া। গধা পা -া। গপা মা গা I
ম ম ০ বি০০ জ০ন ০ চি০ র ০ গো০ প ন
জা গে ০ চে০০ ত০না ০ শ০ ত ০ বে০ দ না
ল ভি ০ শ০০ ক০তি ০ প্রে০ ম- ০ ভ০ ক তি
আ মি ০ তৃ০০ ষি০ত ০ আ০ ছি ০ ক্ষু০ ধি ত
য ত ০ সাধ০ না০০ ০ ব্র০ ত ০ কা০ ম না

২´ ৩ ০ ১
I গা মা -া। ঋগা সা -া। সা -া -া। সা ঋা -া I
দুঃ খ- ০ বি০ তা ০ ন ০ ০ হৃ দি ০
মৃ ত ০ জী০ ব ০ নে ০ ০ ত ব ০
ত ব ০ আ০ র ০ তি ০ ০ ক রি ০
যা চি ০ অ০ মৃ ০ ত ০ ০ ত ব ০
স ব ০ স০ ফ ০ ল ০ ০ ত ব ০

২´ ৩ ০ ১
I সা ঋা -া। সঋা গমা পা। মগা ঋা -া। -া -া -া I
আ স ০ নে০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা ঋা -া। সা ন্া -া। সা -া -া। -া -া -া I
(৪) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা ঋা -া। সঋা গমা পা। মগা ঋা -া। -া -া -া I
প র ০ শে০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা ঋা -া। সা ন্া -া। সা -া -া। -া -া -া I
(৫) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা ঋা -া। সঋা গমা পা। মগা ঋা -া। -া -া -া I
জী ব ০ নে০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা ঋা -া। সা ন্া -া। সা -া -া। -া -া -া I
(৬) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ • ১
I র্সা র্রা -া। র্সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I
স কা • শে • • • • • • • • • • • •

২´ ৩ • ১
I গা রা -া। সা ন্‌া -া। সা -া -া। -া -া -া I
(৭) তু মি • এ স • হে • • • • •

২´ ৩ • ১
I র্সা র্রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I
সা ধ • নে • • • • • • • • • • •

২´ ৩ • ১
I গা রা -া। সা ন্‌া -া। সা -া -া। -া -া -া I
(৮) তু মি • এ স • হে • • • • •

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—৪ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিয়াই ১, ২ এবং ৩ নম্বরের "তুমি এস হে" যথাক্রমে গেয়। তাহার পর, পরবর্ত্তী কলি গেয়। ঠিক এই নিয়মেই ৫, ৬, ৭ এবং ৮ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিবার পরে পরেই, প্রত্যেক বারে ১, ২ এবং ৩ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিয়া, তখন অন্যান্য কলি ধরিতে হইবে। এই নিয়মে, গাহিতে পারিলে এই গানটি ভারি শ্রুতিমধুর হইবে।

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৮)

নির্জ্জন কক্ষে 'সোফা'র উপর আড় হইয়া পড়িয়া নমিতা আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। যদিও যন্ত্রণাধিক্যে তাহার শরীর-মন অস্বাচ্ছন্দতায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বিভিন্ন-ঘটনা-সংঘাতে উত্তেজিত চিন্তাশক্তি, তাহার মনোবৃত্তিগুলাকে ফাঁকে পাইয়া, প্রথমেই তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া ছুটাইল, তাহার সেই প্রত্যহের অভ্যস্ত কর্ম্ম-সংস্কারের দিকে! এই সুন্দর উদ্যম-আনন্দে সচেতন, স্নিগ্ধ-মধুর সন্ধ্যাকাল,—ইহা যে প্রতিদিন রোগি-নিবাসের সেবাব্রতের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, অক্লান্ত উদ্যমে তাহার শ্রম-চর্চ্চা করিবার সময়!—ইহা কি এই সুসজ্জিত আলোকোজ্জ্বল কক্ষের মাঝে সুকোমল 'সোফা'য় পড়িয়া অলস- ও নিশ্চেষ্ট-ভাবে যাপিত করা সহ্য হয়! এ যে বড় কষ্ট-কর আরাম-উপভোগ!

কিন্তু গত্যন্তর নাই! নমিতা প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিয়া, নিস্পন্দ হইয়া 'সোফা'র উপর পড়িয়া রহিল। মনে সে ভাবিতে লাগিল, হাঁসপাতালের কথা! তাহার অনুপস্থিতির জন্য হাঁস্‌পাতালে, হয়ত, এতক্ষণ গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে! বেচারী চার্ম্মিয়ান্, হয়ত, খুব ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার জন্য পথ চাহিয়া রহিয়াছে!...... আবার আহা, নমিতার কর্ত্তব্যের অংশভার যাহাদের আজ হইতে বহিতে হইবে, তাহারা ঐ অধিকন্তু খাটুনীর জন্য কত কষ্ট পাইবে! হয়ত, কেহ মনে মনে বিরক্ত হইবে, কেহ প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানাইবে! আবার কেহ বা কটু-কাটব্য-বর্ষণেও হয়ত বা, ত্রুটি করিবে না।

নমিতার আর শুইয়া থাকা পোষাইল না। সে উঠিয়া সোফার উপর সোজা হইয়া বসিল; একবার মনে করিল ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া হাঁস্‌পাতালে হাজির হয়!......কি তুচ্ছ এই সামান্য দৈহিক যন্ত্রণা! স্মিথের মাতৃস্নেহ-করুণা-মণ্ডিত নয়নে ইহা যতই কষ্টকর-যন্ত্রণা হউক, কিন্তু নমিতার পক্ষে ইহা এখন সত্যই আর বিশেষ-কষ্টবহ বেদনা নহে! কিন্তু সামান্য এইটুকুর জন্য, সৌখীন-ক্লান্তি-অবলম্বনে সে এখানে অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া রহিল, আর সেখানে যে এই অজুহাতে 'দশ-বিশ-লক্ষ' মন্তব্য সংগঠিত হইবে, তাহার কঠিন গুরুত্ব তাহার বড়ই অসহ্য! ছুরির ফলার তীক্ষ্ণ কঠিনতার মধ্যে একটা মহৎ গুণ আছে,—সারল্য! কিন্তু, মানুষের শাণিত রসনার শ্লেষ-ব্যঙ্গ,—না না, সে বক্র প্যাঁচের নির্দ্দয় তীক্ষ্ণতার ত্রিসীমানায়, কোন-জাতীয় সমবেদনা তিষ্ঠাইতে পারে না!...তবে? তবে উপায়?...

ব্যগ্র ব্যাকুল মনের উপর বজ্র-চমকে স্মৃতি ঝলসিয়া গেল,—ইহা স্মিথের আদেশ! —নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমর্ষভাবে নমিতা 'সোফা'র উপর আবার শুইয়া পড়িল। থাক্, স্মিথ্ যখন দয়া করিয়া স্নেহের দাবীতে, স্বেচ্ছায় কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কোনও কথা কহিবার অধিকার নমিতার আর নাই! নিষ্ফল অসন্তোষ দূর হউক্! যা হইবার হইবে। স্মিথ্ বুঝিবেন্! তিনি নমিতাকে নিশ্চিন্ত থাকিবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন,—নমিতা দুশ্চিন্তা বিড়ম্বনার বোঝা ঘাড়ে লইয়া এখানে নিরুপায় নিশ্চিন্ততার আরাম ভোগ করুক্। বিপ্লবের ঝড় বাহিরে বহিয়া যাক্!

কিন্তু এই নিশ্চিন্ততার আরামটুকু তাহার গায়ে যে তীব্র ঘৃণা-অস্বস্তির অঙ্কুশ হানিতেছে! নিস্তব্ধভাবে শুইয়া থাকিবার সাধ্য কি? নমিতার মনে হইতে লাগিল, এই যে আরাম-উপভোগ,—ইহা এখন নিতান্তই দস্যুতালব্ধ সম্পত্তির মত অন্যায় অধর্ম্মার্জ্জিত। অন্যের কষ্টভোগ বাড়াইয়া —এই যে নিজের শ্রান্তি-অপনোদন,—ইহা তাহার কাছে বড়ই ঘৃণাকর! কিন্তু স্মিথের স্নেহ-অনুকম্পাটা মাঝখানে জুটিয়া বড়ই গোলযোগ বাধাইয়াছে!

চোখের সম্মুখে মানুষের মুখের ভিড় বেশী জমিলে দৃষ্টিশক্তিটা বাহিরের দিকেই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হয়, ভিতর দিকে ফিরিবার অবকাশ তাহার ঘটিয়া উঠা দায় হইয়া থাকে।—তা ছাড়া, বাক্‌শক্তির ঝঙ্কার-সংঘাতে চিন্তাশক্তিটা, অনেক সময়, থতমত খাইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। এতক্ষণ নমিতার অবস্থাও কতকটা তাহাই হইয়াছিল। এইবার

স্তব্ধ নির্জ্জন কক্ষের মাঝে কর্ম্মহীন উদাস চিত্তটা আচ্ছন্ন করিয়া খুচ্‌রা দ্বন্দ্বের আলোড়ন চলিতে চলিতে, সহসা মস্তিষ্ক-যন্ত্রটিকে তীব্র উত্তেজনায় সন্ত্রস্ত-চকিত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে গভীরতর দ্বন্দ্ব-বিপ্লব জাগিয়া উঠিল। নমিতার মনে পড়িয়া গেল, ডাক্তার মিত্রের আজিকার ব্যবহার, এবং নমিতার আত্মকৃত আচরণ!

মাথা ঠিক্ করিয়া খুব ভালরূপে সমস্ত ঘটনাটা তলাইয়া ভাবিয়া যথাসাধ্য নিরপেক্ষ হইয়া নমিতা বিচার করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। কোন্‌খানে কাহার কতখানি দোষ আছে, তাহার মাপ জোঁক পরে হইবে, আগে নিজের ব্যবস্থাটা পরীক্ষা করা হউক্!...... নমিতা হাতের উপর মাথা রাখিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।—না, তাহার আজিকার ব্যবহারটা ভাল হয় নাই; মোটেই ভাল হয় নাই! ন্যায় এবং সত্য যত বড়ই ও মহৎ পবিত্র বস্তু হউক্, কিন্তু পঞ্চভূত-গঠিত এই মাথাটার উপর যাঁহারা ঊর্দ্ধতন হইয়া আছেন, তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে অসন্তোষ বিরক্তি প্রকাশ করা, যেমনি দুঃসাহসিকতা, তেমনি নির্লজ্জ-ধৃষ্টতা!

নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল; তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বড়ই গরম বোধ হইতেছিল। জামাটা খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে সে ভাবিল,—না, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, হাঁসপাতালের চাকুরী আর নয়! মানুষের নীচতা-সংঘাতে এক ত তাহার মনও অবনত হইয়া পড়িতেছে, তাহার উপর আর একটা নিদারুণ কষ্ট!—যাঁহারা ঊর্দ্ধতন সম্মান-পাত্র,—তাঁহাদিগের ব্যবহারকে ঘৃণা করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তের ঘটনায় ক্ষুব্ধ-বিদ্বিষ্ট হইয়া, চিত্তবিক্ষেপ ঘটাইয়া, তাহার বড় লোক্‌সান হইতেছে। সময়ে সাবধান হওয়া ভাল। ডাক্তার মিত্রের সহিত এই যে মনোমালিন্য আরম্ভ হইল, ইহার চরম পরিণতি কোথায় গিয়া সমাপ্ত হইবে, কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ, সে ক্ষুদ্রপ্রাণ, ক্ষীণশক্তি মানুষ। প্রতিপক্ষ যখন প্রবল, তখন সন্তর্পণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংশ্রব এড়াইয়া চলাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

জামা খুলিতে খুলিতে ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর দেওয়া সেই পত্রখানা নমিতার হাতে ঠেকিল। তাহার মনে পড়িল, তিনি উহা অবসর-সময়ে পাঠ করিতে বলিয়াছেন! এই ত অবসর! নমিতা একবার দ্বারের দিকে চাহিল;—কাহারই আসিবার সম্ভাবনা নাই, বুঝিল। আলো উস্কাইয়া দিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিল। মুহূর্ত্তে সে হত-বুদ্ধি হইয়া পড়িল! দেখিল, পত্রের সহিত দুইখানি নোট! একখানি পঞ্চাশ টাকার ও অন্যখানি পাঁচ টাকার!

নোট-দুইখানার এ-পিঠ ও-পিঠ একবার উল্টাইয়া দেখিয়া নমিতা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রুদ্ধশ্বাসে পত্র পড়িতে লাগিল:—

"বিনীত নিবেদন,

পীড়িত পাচকের আশ্রয়দাত্রী করুণাময়ীর সন্ধান পাইয়াছি। দেবর নির্ম্মলবাবু ছাড়া আর কেহ এ সংবাদ জানে না, জানিবেন। যদি ঘৃণা না করেন, তবে অনুতপ্ত-বেদনার অশ্রুজলের সহিত আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। বেশী লিখিতে পারিতেছি না।

"মুখোমুখী এ প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। আমার মাতার দেওয়া তত্ত্ব প্রভৃতির দরুণ প্রাপ্ত টাকা হইতে পঞ্চান্নটি টাকা দিলাম। অতঃপর বালকটির চিকিৎসা-খরচে যাহা লাগিবে, তাহা দিয়া, বাকী টাকা তাহার হাতে দিবেন, এবং যাহাতে সে নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। অন্য সুবিধা না থাকায়, আপনাকেই এ-সব দুঃখভোগের দায়ী করিলাম। নিরুপায়জ্ঞানে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

'আর একটি অনুরোধ। ঠাকুরকে এ বাড়ীতে আর আসিতে দিবেন না; এবং তাহাকে বা অপর কাহাকেও আমার নাম-সংক্রান্ত কোনও কথা জানাইয়া, মর্ম্মপীড়া বাড়াইবেন না। আপনার উন্নত-স্নেহ-ক্ষমা-শীল হৃদয়ের উপর অকপট বিশ্বাস-নির্ভর স্থাপন করিয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম, ভুলিবেন না। ইতি

ক্ষমাপ্রার্থিনী

শ্রীসরমা মিত্র।"

বিশ্রস্ত-সুপ্ত মানুষের 'রগে' অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত বাজিলে, সে যেমন বিকল ও মুহ্যমান হইয়া অর্থশূন্য-দৃষ্টিতে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, নমিতাও ঠিক তেমনি ভাবে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল!......মুক্ত স্বাধীনতার হাত ফস্কাইয়া, হঠাৎ তাহার সতেজ ক্রিয়াশীল হৃদ্‌যন্ত্রটা যেন একটা কঠোর পরাধীনতার দৃঢ় নিষ্পীড়নে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। ইচ্ছাধীনভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণের ক্ষমতাও যেন তাহার লুপ্ত হইয়া গেল! নমিতা পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

নিস্পন্দ-নির্জ্জীবভাবে নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। মাথার ভিতর একটা জটিল গোলমালের প্রলয়-আলোড়ন চলিতেছিল। ক্ষিপ্ত বিদ্রোহ-সংঘর্ষে হৃদয়াভ্যন্তরে অনুভূতি-প্রবাহে বিরাট বিশৃঙ্খলা বাধিয়া গিয়াছিল; নমিতার মনে হইল, এক মুহূর্ত্তে সে যেন কি একটা অদ্ভুত কিছু বনিয়া গিয়াছে!

অনেকক্ষণ পরে, অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। স্মিথের টেবিলের উপর হইতে এক টুক্‌রা কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিল, "বাড়ীতে একটা জরুরী কাজ ভুল করিয়া আসিয়াছি, শীঘ্র ফিরিতে বাধ্য হইলাম, ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। আমার হাতে এখন কোন যন্ত্রণাই অনুভূত হইতেছে না, নিশ্চিন্ত থাকিবেন। নমিতা।"

ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর পত্রখানা সন্তর্পণে জামার ভিতর লুকাইয়া, কুশ ও সূতার গুলি হাতে লইয়া, নমিতা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল। বারেণ্ডায় স্মিথের বেহারার সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, সে সেলাম করিয়া জানাইল, "সুশীলকে সে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে। বিমল-বাবু কার্য্যগতিকে ব্যস্ত আছেন, শীঘ্রই এখানে আসিতেছেন।"

নমিতা রুদ্ধস্বরে বলিল, "বহুৎ আচ্ছা! জরুরী কাম্‌কো বাস্তে হাম্ আবি মোকাম্ পর যাতা।—মেম-সাব আনেসে বোলো, টেবিল পর লিখ্‌কে আয়া......ঔর মেরা হাঁথ্ আবি আচ্ছা হুয়া!"

মিস্ স্মিথ্ নমিতাকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া ভৃত্যেরা নমিতার সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিত। নমিতা ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটা

সাবধানে ডানহাতে ধরিয়া, বারেণ্ডার সিঁড়ি হইতে খুব ধীরে ধীরে নামিতেছে দেখিয়া, বেহারা পুনশ্চ অভিবাদন করিয়া সসৌজন্যে বলিল, "জী, বড়ি আঁধার হুয়া, একঠো বাত্তি লেকে, আপ্‌কো সাথ্—।"

পরের কষ্ট-অসুবিধা ঘটাইয়া, নিজের সুবিধা গুছাইয়া লইতে নমিতার দ্বিগুণ অসুবিধা বোধ হয়! ভৃত্যের প্রস্তাবে সে ব্যস্ত হইয়া, বাধা দিয়া বলিল, "কুচ্ কাম নেহি, সাম্‌কো বহুৎ বহুৎ আদমী যাতে আঁতে হৈ।—কেয়া ডর!"

বেহারা মাথা নাড়িয়া সমর্থনসূচক স্বরে বলিল,—"বহুৎ—খুব্—!"

নমিতা রাস্তায় নামিয়া, যথাসাধ্য দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর অন্ধকার হইলেও আকাশে তারা থাকায়, তাহা তেমন গাঢ় হয় নাই। মোড়ের মাথায় 'লাইট-পোষ্টে'র আলোয় পথগুলি আলোকিত। সংখ্যায় অল্প হইলেও পথে লোক-চলাচল হইতেছিল। নমিতা কাহারো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বিরাট বিষণ্ণতার ভারে অভিভূতচিত্তে, ক্লান্ত নির্জ্জীবের মত পথাতিবাহন করিয়া চলিল।

দুই তিনটা মোড় ঘুরিয়া, বাড়ীর কাছে শেষ তে-মাথারি মোড়ে 'লাইট-পোষ্টে'র নিকট আসিয়া পৌছিতেই, সহসা সাম্‌নে হইতে একদল সঙ্গীতমত্ত লোক আসিয়া পড়ায়, নমিতার গতিরোধ হইল। লোকগুলি নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুস্থানী; উৎকট সুরা-দুর্গন্ধের তীব্রঘ্রাণে চমকিত হইয়া নমিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিল।—সর্ব্বনাশ! ইহারা সকলেই যে অপ্রকৃতিস্থ!

অসহায় নমিতার আপাদমস্তকে, ভয়-ব্যাকুলতার তীব্র কম্পনপ্রবাহ বহিয়া গেল! সন্ধ্যারাত্রে প্রকাশ্য রাজপথের উপর কোনও ভয় নাই সত্য; কিন্তু এমন সঙ্গিহীন অবস্থায় হঠাৎ সম্মুখে ভয়ঙ্কর কিছু দেখিলে, তাহার মত ক্ষীণশক্তি মানুষের প্রাণ কোন্ সাহসে স্থির থাকিবে! সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র,—ক্ষুদ্রতর উপলক্ষ্য থাকিলেও কথা ছিল; কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা!

দু-পাশে প্রাচীর-বেষ্টিত বাড়ী, পিছনে অন্ধকার গলি! নড়িবার সরিবার পথ নাই, উপায় নাই, সময় নাই! উহারা আসিয়া পড়িয়াছে! নমিতা প্রাণপণে আপনাকে শক্তি-সংযত করিয়া, আলোকস্তম্ভের গা ঘেঁসিয়া, আহত হাতখানা আড়াল করিয়া, আড় হইয়া দাঁড়াইল। ঘাড় বাঁকাইয়া নতদৃষ্টিতে রুদ্ধশ্বাসে মাতালদের স্খলিত চরণগতি লক্ষ্য করিতে লাগিল! যদি মত্ততার ঝোঁকে কেহ এই দিকে টলিয়া পড়ে,—তবে হে ভগবন্,—আত্মরক্ষার শক্তি দিও!

ভগবান্, বুঝি, তাহা শুনিলেন। নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী বলিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, এই অপ্রকৃতিস্থ মাতালদের দৃষ্টিতে মানুষের মত শিষ্টপ্রকৃতিস্থতা কিছু ছিল। অগ্রবর্ত্তী দুইজন সাম্‌নে নমিতাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত থামাইল এবং সন্ত্রস্ত হইয়া পিছনের 'চূড় মাতাল' সঙ্গীগুলির উচ্ছৃঙ্খলতা সংযত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

পাশের লোকটা মদিরালস নয়নে চলিতে চলিতে খুবই টলিতেছিল। একটা ছোট হোঁচট্ খাইয়া, নেশার ঝোঁকে অভিভূত

শরীরটার ভার সাম্‌লাইতে না পারিয়া, সে সবেগে ঘুরিয়া আসিয়া 'লাইট-পোষ্টে'র তলায় আছাড় খাইবার যো করিল।

হঠাৎ পিছনের অন্ধকার গলির ভিতর হইতে আর একজন লোক উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া নমিতার পার্শ্বে পৌছিল। নমিতার দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া, ক্ষিপ্র সতর্কতায় দুইহাতে পতনোম্মুখ লোকটাকে ধরিয়া ফেলিল। সবেগে এক ঝাঁকুনী দিয়া তাহাকে সোজা করিয়া, রুদ্ধস্বরে বলিল "আপ্‌নে ডেরা পর্‌ চলা যাও ভাই!—"

দলের প্রকৃতিস্থ দুইজন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইল। অত্যন্ত অপ্রতিভ-ভাবে সবিনয়ে ক্ষমা চাহিয়া উপর্য্যুপরি সেলাম ঠুকিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় হড়্‌ বড়্‌ করিয়া নানা কথা সে বকিয়া গেল। তাহার মধ্যে একটি কথা নমিতা শুধু বুঝিল,—"আপ্‌কো মঙ্গল হোক্‌, হামি লোক্‌ তো আপ্‌কো........।"

পরিস্পরকে ধাক্কা মারিয়া, ঠেলিয়া, টানিয়া লইয়া, খুব ব্যস্তভাবে তাহারা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

সাহায্য-কর্ত্তাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইবার জন্য ফিরিয়া, তাহার পানে চাহিয়া নমিতা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল! এ যে—সেই, সুরসুন্দর!

সুরসুন্দরও বিস্ময়বিমূঢ়-ভাবে নমিতার পানে চাহিয়া রহিল। প্রথমতঃ সে কথা কহিতে পারিল না; তারপর মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "আপ্‌নি! ছি ছি, বড় ছেলেমানুষী করেছেন ত! এমন সময় একলাটি রাস্তায়...! কাজটা ভাল হয় নি। ... আমি ভেবেছিলাম, আর কেউ!"

নমিতার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল। অতি-কষ্টে, আরক্ত মুখে সে বলিল, "বুঝ্‌তে পারি নি। ভাগ্যিস, আপনি..., কি উপকার যে কর্‌লেন! আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবার ভাষা..."

বাধা দিয়া শুষ্ক ম্লান-মুখে সুরসুন্দর বলিল, "দয়া করে ও-সব বিড়ম্বনা-ভোগের দায় থেকে নিষ্কৃতি দেন! একটু দাঁড়ান, আস্‌ছি।"

সুরসুন্দর দ্রুতপদে পার্শ্বের অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকিল; ক্ষণপরে একজন জীর্ণ-শীর্ণ কুব্জনতদেহ বৃদ্ধের হাত ধরিয়া, সাবধানে তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিল। নমিতা অবাক্‌ হইয়া দেখিল, বৃদ্ধটি তাহাদের হাঁস্‌পাতালের মেথর 'রম্‌ণার' বৃদ্ধ পিতা —'জীবলাল মেথর'।

নিকটে আসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপ্‌নি আগে চলুন—।" নমিতা বিনা-বাক্যে চলিতে লাগিল। সুরসুন্দর মৃদু-স্বরে বলিল, "স্মিথের কুঠিতে খোঁজ নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌ছি; স্মিথ্‌ বলে দিলেন, কাল সকালেই একখানা দরখাস্ত সই করে ক্লার্কের কাছে পাঠাবেন, সাহেব সাতদিন ছুটি দিতে রাজি হয়েছেন।...আর সমুদ্রপ্রসাদ কাল সাড়ে ছ'টার সময় গিয়ে আপনার হাতটা ধুয়ে দিয়ে আস্‌বে, বলে দিয়েছি।"

নমিতা বলিল, "ধন্যবাদ! আমার 'ডিউটী'টা কার হাতে পড়্‌ল, জানেন?"

সুরসুন্দর বৃদ্ধের হাত ধরিয়া একটা উঁচু নালী পার করাইতে করাইতে বলিল, "আমার; সঙ্গে ছোট কম্পাউণ্ডার দেবীশঙ্কর থাক্‌বে।"

ইতস্ততঃ করিয়া নমিতা বলিল, "ডাক্তার

মিত্র কিছু বলেন নি ত? আপ্‌নি দেরী করে যাওয়ার জন্যে?”

ম্লানমুখে ঈষৎ হাসিয়া সুরসুন্দর বলিল, “ডাক্তার-সাহেবকে কে কি বলেছেন বুঝি! সাহেব কি বলেছেন, জানি না। ওরা ত বলাবলি কর্‌ছিল। স্মিথ্ শুনে চটে গেছেন,… তাই আপনাকে তাড়াতাড়ি ‘এ্যাপ্লিকেশনের’ কথা বল্‌তে পাঠালেন।… যাক্, ও-সব বাজে কথা শোন্‌বার জন্যে কান পেতে বসে থাকলে ত কোনই কাজ কর্‌বার সময় পাওয়া যাবে না। শীঘ্র চলুন।”

নমিতা শীঘ্র চলিতে লাগিল। বলিবার মত কোন কথা সে হাতের কাছে খুঁজিয়া পাইল না; অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ডাক্তারবাবুর কি চমৎকার স্বভাব!

কিন্তু থাক্, সে-সকল আলোচনা লইয়া আর চিত্তগ্লানির উদ্বর্ত্তনে কাজ নাই। পরের দোষ-ত্রুটির চর্চ্চায় ক্রমাগত দৃষ্টিশক্তিকে খাটাইলে, শেষে হয়ত সাঙ্ঘাতিক চক্ষুঃ-পীড়া আবির্ভূত হইবে।…অতএব এ-সকল বিষয়ে খানিকটা পাশ কাটাইয়া চোখ্-কাণ বুজিয়া থাকাই ভাল। নমিতা মনটাকে ধমক দিয়া শান্ত-নিরীহ বানাইয়া লইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল!

উঁচু নীচু অসমতল পথে চলিতে ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ জীবলাল ক্রমাগতই ঠোক্কর খাইতেছিল। সুরসুন্দর সতর্ক হইয়া তাহাকে সাম্‌লাইয়া লইতেছিল। এইবার তাড়াতাড়ি চলার জন্য বৃদ্ধ অসাবধানে একটা বড় রকম হোঁচট খাইয়া টলিয়া পড়িবার উপক্রম করিলে সুরসুন্দর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বুক পাতিয়া নিঃশব্দে তাহার বার্দ্ধক্য-জীর্ণ অসমর্থ দেহের ভারটা সাম্‌লাইয়া লইল। তাহার কাঁধের উপর বৃদ্ধের মুখ থুব্‌ড়াইয়া গেল। সুরসুন্দর তাহাকে সোজা করিয়া, তাড়াতাড়ি দাড়িতে হাত বুলাইয়া দিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, “বড়া লাগল বৈ?”

“নেই বাপ্, কুছ নেই!—”এই বলিয়া সজোরে মাথা নাড়িয়া বৃদ্ধ আঘাত-বেদনাটা অস্বীকার করিয়া প্রীতি-কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল বদনে বলিল, “জীতা রও বাপ্, আজ তোম্‌কো নেহি মিল্‌নেসে হাম্ তো রাস্তে পর মর্ যাতা—।”

সুরসুন্দর সে কথায় কান দিল না; মাথা হেঁট করিয়া ঘাড় বাড়াইয়া দিয়া বলিল, পাক্‌ড়ো হাম্‌রা কান্ধা।—হাঁ চলো।…মিস্ মিত্র,একটু আস্তে—।”

নমিতা নীরবে মুখ ফিরাইয়া একবার মুগ্ধ-করুণ দৃষ্টিতে উভয়ের অবস্থাটা দেখিয়া লইল; তারপর আবার পূর্ব্বের মত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

সম্মুখ হইতে আর একদল লোক আসিল। নির্ভয়ে ক্রীড়ারত কপোত-শিশু অকস্মাৎ সম্মুখে উদ্যত-নখর বাজপাখী দেখিলে যেমন সভয়ে চমকিয়া উঠে,—কে জানে কেন, অন্যমনস্ক নমিতাও আজ হঠাৎ দত্তজায়ার মুখপানে চাহিয়া, অন্তর-মধ্যে কেমনিতর একটা তীব্র-চমক খাইল! কি কহিবে ভাবিয়া পাইল না; তাড়াতাড়ি আঁচলটা টানিয়া ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতখানার উপর ঢাকা দিল।

সাচ্চা জরির ‘বাদ্‌লা’ বসান, লেশের বিপুল আড়ম্বরশ্রী-যুক্ত, মূল্যবান্ জ্যাকেট ও সাড়ির খস্‌খসে শব্দের সহিত জুতার খট্‌খট্

শব্দ মিশাইয়া, স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষগম্ভীর কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মিহি-কোমল করিয়া, হাসি-হাসি-মুখে গল্প করিতে করিতে দত্তজায়া আসিতেছিলেন। সঙ্গে ডাক্তার মিত্রের 'মনের মত' পরিহাস-রসিক বন্ধু, স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীলের কীর্ত্তিমান্ বংশধর 'নিরেট বখা'-নামে বিখ্যাত 'হিতলালবাবু', সৌখীন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিতেছিলেন। দত্তজায়ার ভৃত্য আলো হাতে লইয়া আগে আগে আসিতেছিল।

পিছনে আর তিনজন পথিক তাঁহাদের আলোয় পথ দেখিয়া আসিতেছিল। তাহাদের একজন বৃদ্ধ, একজন যুবা ও অপরটি কিশোর বালক। বৃদ্ধটি বিরক্তি-কুটিল দৃষ্টিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দত্তজায়াকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। যুবাটি সহরে ফাজিল ;—সে বিদ্রূপবর্ষী হাসি-মাখা মুখে ও বক্র কটাক্ষে একবার হিতলাল-বাবুকে ও একবার দত্তজায়াকে দেখিতেছিল, আর ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গীর সহিত নানা ছাঁদে কাশিতে কাশিতে হাসিতেছিল। বালকটি নির্ব্বোধ; সে কৌতূহল-বিস্ফারিত নয়নে তাহাদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া চলিতে চলিতে বারংবার হোঁচট খাইতেছিল।

চকিতদৃষ্টিতে পিছনের লোক-তিনটির পানে চাহিয়া নমিতার আভ্যন্তরিক সঙ্কোচ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল! ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে একবার দত্তজায়ার পানে চাহিয়া সে মাথা হেঁট করিয়া, কুণ্ঠিতভাবে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

সুরসুন্দর চোখ তুলিয়া একবার তাঁহাদের সকলকে দেখিয়া লইল। বন্ধুপ্রীতির অনুরোধে হিতলালবাবু প্রায়শঃ হাঁসপাতালে ডাক্তারদের বসিবার ঘরে আসিয়া আড্ডা দেন। সুতরাং, হাঁস্‌পাতালের সকলেই তাঁহাকে চেনে। সুরসুন্দর তাঁহাকে একটা ছোট নমস্কার করিয়া চোখ নামাইল। তারপর বৃদ্ধ মেথরের পায়ের নীচেকার পথটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে নিরীক্ষণ করিতে সে সবিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ক্ষুদ্র গোল গোল চোখের তীব্র প্রখর দৃষ্টি হানিয়া দত্তজায়া একবার সুরসুন্দরকে ও একবার নমিতাকে দেখিয়া লইয়া কর্ত্তৃত্ব-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল সব ?"

নমিতা কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, দত্তজায়ার ভৃত্যটি হাতের লণ্ঠনটা বৃদ্ধ মেথরের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া, অকুণ্ঠিত স্পর্দ্ধায় উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "বা বা, কম্পাউণ্ডার-সাহেব, 'ভঙ্গিকো' হাঁথ পাকড়'কে আপ্ কৌন 'স্বরগো'মে লে যাতা ?"

কোন্ স্বর্গে লইয়া যাইতেছে, তাহার নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক বিবেচনায় সুরসুন্দর চুপ করিয়া রহিল। বৃদ্ধ মেথর লজ্জায় 'এতটুকু' হইয়া কুণ্ঠিতহাস্যে বলিল, তাহার পুত্র রমণার আজ 'জান্ খারাব' হইয়াছে, তাই সে তাহার 'উদ্দিপর কাম বাজাইতে' 'সার্জ্জিক্যাল ওয়ার্ডে' গিয়াছিল ; রাত্রি হইয়া যাওয়ায় 'অন্ধা বুড়াকে' দয়া করিয়া কম্পাউণ্ডার-সাহেব দিয়াশলাই কাঠি জ্বালিয়া পথ দেখাইয়া আনিতেছিলেন, কিন্তু বাক্স খালি হওয়ায়, অবশেষে হাত ধরিয়া পথটুকু পার করিয়া দিতেছেন।

নমিতা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের পানে চাহিয়া তাহার কথাগুলা শুনিয়া লইল ; দত্তজায়ার কথার উত্তর দিতে ভুলিয়া গেল।

দত্তজায়া পুনশ্চ বলিলেন, "তুমি কি হাঁস্‌পাতাল থেকে আস্‌ছ ?"

নমিতা সংক্ষেপে বলিল, "না; স্মিথের কুঠি থেকে আস্‌ছি; হাঁস্‌পাতালে যেতে পারি নি।"

দত্তজায়া ব্যগ্রভাবে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন; খুব সম্ভব, তাহা কৈফিয়তের "কেন ?"—কিন্তু হিতলালবাবু মাঝে পড়িয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "আজ তা হ'লে আপনাকে আর হাঁস্‌পাতালে যেতে হবে না ? বেশ ত, চলুন না তা হ'লে আমাদের ওখানে তাসটাস খেলা যাক্। ব্যারিষ্টার পিয়ার্সনের মেয়ে মিস্ এলিন্ আস্‌বেন, আরও অনেক ভাল ভাল লোক থাক্‌বেন। চলুন সকলের সঙ্গে 'ইণ্ট্রোডিয়ুস' করে দেব আপনার; চলুন চলুন... ।"

স্বল্প-পরিচিত ভদ্রসন্তানটির নিকট অতর্কিতে এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের তাড়া খাইয়া নমিতা হঠাৎ থতমত খাইয়া গেল। হতবুদ্ধির মত ক্ষণেক নির্ব্বাক্ থাকিয়া, কোনওরূপে আত্মদমন করিয়া শিষ্টভাবে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিল, "তাসখেলা...ক্ষমা করুন্।"

হিতলালবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কেন, আপত্তি কি ?"

নমিতা গোলে পড়িল; ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বাড়ীতে বড় কাজ আছে। না হ'লে, এ সৌভাগ্য···!"

হিতলালবাবু পরম আগ্রহে বলিলেন, "বাজে গুজব রাখুন। বাড়ীতে কাজ মানুষের চিরদিনই থাকে, তা বলে কে আর···। এই ত মিসেস্ দত্ত যাচ্ছেন, ডাক্তার প্রমথবাবুও এখুনি আস্‌বেন। আপনাকে নিয়ে যেতে পার্‌লে 'পার্টি' জম্‌বে ভাল। আপ্‌নার কথা আমরা প্রায়ই বলাবলি করি। কি বলেন মিসেস্ দত্ত! হা—হা—হা—!" এইরূপে তিনি খাম-খেয়ালি কৌতুকে জোর গলায় হাসিয়া উঠিলেন। দত্তজায়ার দৃষ্টিতটে অপ্রসন্নতার মেঘ ঘনাইয়া উঠিল; কোনওমতে অনিচ্ছার দমন করিয়া তিনি মোসাহেবের তোযামোদের স্বরে একটু খাপ্‌ছাড়া হাসি হাসিয়া মাথামুণ্ড উত্তর যোগাইলেন,"—বিলক্ষণ।"

সে-কথার অর্থটা এ-ক্ষেত্রে কিরূপ ভাবব্যঞ্জক হইবে, তাহা দত্তজায়া স্বয়ং বুঝিলেন কি না সন্দেহ, কিন্তু একটা কিছু বলা ত চাই, তাই তিনি যাহা মুখে আসিল তাই বলিলেন।

হিতলালবাবুর সে হাসি নমিতার সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নমিতার মনে পড়িল যে ছেলেবেলায় সে তাস খেলিতে খুব ভাল বাসিত বটে, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সে আর তাস হাতে করে নাই। নমিতা মনটা চাঙ্গা করিয়া লইল। সবিনয়ে সেই কথাটা ব্যক্ত করিয়া এ প্রসঙ্গের মুড়া মারিয়া দিয়া নমিতা বিদায় লইবার সঙ্কল্প করিল; কিন্তু তখনই পরিহাস-রসিক হিতলালবাবুর ঘৃণিত-কঠোর হৃদয়হীনতার হাস্য-লাঞ্ছিত প্রকাণ্ড মুখখানার উপর দৃষ্টি পড়িতেই মন দমিয়া গেল। অসম্ভব! না, কিছুতেই না! এখানে সে-কথা ব্যক্ত করিয়া উঁহাদের উপহাস-হাস্য-বিচ্ছুরিত ব্যঙ্গদার যুক্তি তর্ক উপদেশ শুনিয়া সে হৃৎপিণ্ডের কাঁচা ঘা-টা বেত্রাহত হইতে দিবে না! তাহাতে মিথ্যা কহিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে হয়, সেও

তাস ! নমিতা ধীরভাবে বলিল, "আমি তাস খেল্‌তে জানি না।"

হিতলালবাবুর উৎসাহ অসীম ! তিনি ব্রস্তভাবে বলিলেন, "না জানেন, নেই নেই ; আমি শিখিয়ে দেব। চলুন। রাতদিন মেথর-মুদ্দফরাসের সঙ্গে মড়া ঘেঁটে মনটা জেরবার্ হয়ে পড়ে না ! একটু আধটু বেড়ান চ্যাড়ান চাই বই কি ? আপনার মত বয়েসের লোকের এমন কোটর-প্রিয়তা আমি কারুর দেখি নি ! সব অনাসৃষ্টি ! চলুন, আজ আর ছাড়্‌ছি নে, বড় বড় লোকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেব। এও ত একটা কম লাভ নয় !"

এমন প্রবল প্রলোভন, প্রচণ্ড সহৃদয়তা, ক্ষীণপ্রাণা নমিতার পক্ষে বড়ই বিষম অসহ্য ঠেকিল ! তা ছাড়া, ভদ্রলোকের অনুরোধ ক্রমশঃ ধৃষ্টতার অঙ্কে গড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া নমিতা মনে মনে বেশ একটু শঙ্কিতাও হইল। দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "এখন আমি যেতে অক্ষম। বাড়ীতে অসুখ বিসুখ। তাছাড়া, নিজের হাতে ক্রূপ বিঁধে যাওয়ায় অল্পক্ষণ হোল স্মিথের কাছে 'অপারেশন' করিয়ে আস্‌চি। কিছু মনে কর্ব্বেন না। নমস্কার।"

কাপড়ের আড়াল হইতে 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতটা বাহির করিয়া সসৌজন্যে নমস্কার করিয়া নমিতা তাড়াতাড়ি সুরসুন্দরের দিকে চাহিয়া বলিল, "আসুন।" নমিতা অগ্রসর হইল। সুরসুন্দরও বৃদ্ধকে লইয়া চলিল।

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে উভয়ের পানে চাহিয়া দন্তজায়া অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন। সুরসুন্দর ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, হিতলালবাবু তীব্র ঈর্ষাকুল কটাক্ষে তাহারই পানে চাহিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বকিতে বকিতে যাইতেছেন। সুরসুন্দরের দৃষ্টিতে ক্ষিপ্ত-ঘৃণায় বিদ্যুৎ জলিয়া উঠিল। সে সবেগে মুখ ফিরাইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

বিংশ অধ্যায়—পশুপক্ষি-প্রতিপালন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুকুর।—

অনেকে কুকুরের গাত্রে একটা জামা পরাইয়া তাহাকে বাটীর বাহির করেন। শৈত্য-নিবারণই এরূপ প্রথার যুক্তি। আব্-হাওয়ার তারতম্যানুসারে কুকুরের সর্দ্দি হওয়া সম্ভব ; কিন্তু আমার মতে আব্‌হাওয়ায় সর্দ্দি ততটা সম্ভবপর নহে, যতটা আর্দ্র গৃহে। সত্য বটে, কুকুরে শৈত্য পছন্দ করে না। ইহার প্রমাণ এই যে, দ্বারের সম্মুখে যথায় বায়ু-স্রোত প্রবাহিত, তথায় কুকুর কখনও থাকিবে না ; বরং শয্যার উত্তাপে শুইয়া থাকিতেই পছন্দ করিবে। ইহাতেই বোধ

হয় যে, শৈত্য কুকুরের মনোমত নহে। কিন্তু তা বলিয়া যে, তাহার একটা কাপড়ের জামা আবশ্যক, তাহা আমি বিবেচনা করি না। কুকুরের গৃহ আর্দ্র না হইলেই হইল।

কুকুরেরা যেমন শৈত্য পছন্দ করে না, তদ্রূপ তাহারা গরমও পছন্দ করে না; সুতরাং, প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় কুকুরকে বাঁধিয়া রাখাই বিধি। কুকুরকে স্নান করান উত্তম প্রথা নহে। তাহাকে মাসে একবার স্নান করাইলে যথেষ্ট হইবে; কিন্তু প্রত্যহ তাহার চুল আঁচ্‌ড়ান আবশ্যক। স্নান করাইতে হইলে, শীতকালে বেলা ১২টার সময় এবং গ্রীষ্মকালে ৯টার সময় স্নান করান উচিত। অনন্তর তাহার গাত্র মুছাইয়া দেয়া যুক্তিযুক্ত। সাবান্ দ্বারা কুকুরের গাত্র পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তদ্দ্বারা কুকুরের কেশের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়। সাবান যেমন মানবের কেশের ক্ষতি-কারক তেমনি তাহা কুকুরের চুলের। ডিম্ব লাগাইলে কুকুরের চুলের পরিচ্ছন্নতার বৃদ্ধি করে। চুলে পোকা হইলে প্রত্যেক ডিম্বের কুসুমে এক চামচ তারপিন তৈল মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে পোকা মরিয়া যায়।

কুকুরকে কখনও কেবলমাত্র ভাত বা রুটি খাওয়াইয়া রাখিবে না। কুকুরেরা মাংসাশী জন্তু। তাহাদিগের দাঁতই এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। সুতরাং, তাহাদিগকে মাংস হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। মাংসে হরিদ্রা বা গরম-মশ্‌লা দিবে না। প্রত্যহ সপ্তাহে খাদ্যের উপর এক চামচ গন্ধক-চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। কুকুরেরা অস্থি বড় ভালবাসে। সুতরাং, মাংসের সহিত একটু অস্থি দেওয়া বিধেয়। কুকুরের জন্য জল এরূপ স্থানে রাখিবে যেন সে তাহা জানিতে পারে। কুকুর যদি খাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করে, তবে তাহাকে খাওয়াইবার কখনও চেষ্টা করিবে না। অজীর্ণ হইলে কুকুরেরা খাইতে চাহে না। অনাহার-দ্বারা উক্ত রোগের প্রতিকার করিতে চাহে। সুতরাং, সেরূপ স্থলে খাইতে দেওয়া অনুচিত।

কুকুরের রোগের ঔষধি।

দাস্ত—দাস্ত করাইতে হইলে এক চামচ শুষ্ক লবণ কুকুরের মুখে দিলে তাহার দাস্ত হইবে।

দুর্গন্ধ :—দুর্গন্ধ হইলে কৃষ্ণ লবণ ½ ছটাক ও হীরেকশ ½ ছটাক একত্র করিয়া আট আনা পরিমাণ খাদ্যের সহিত খাইতে দিবে।

অজীর্ণ :—খয়ের এক ড্রাম, খড়ি ২ ড্রাম, মিশ্রিত দালচিনি ও লবঙ্গ ½ ড্রাম, অহিফেন ৬ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া ১২টী বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং একটি করিয়া বটিকা দিনে তিন বার তাহাকে দিবে।

জ্বর :—কুইনেন ২০ গ্রেণ সেবন করানই বিধি।

ক্রমি :—ক্রমি হইলে ১২ ঘণ্টা কুকুরকে কিছুই খাইতে দিবে না। অতঃপর ওজন করিয়া প্রতিপাউণ্ড ওজনের শুকন্ধে এক গ্রেণ করিয়া সুপারি চূর্ণ খাওয়াইয়া এক ঘণ্টা পরে রেড়ির তৈল পূর্ণ মাত্রায় খাওয়াইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

শিক্ষিতা স্ত্রী।

(ইংরাজী অবলম্বনে)

"আমি আপনার সহিত একমত হ'তে পাচ্ছি না। শিক্ষিতা স্ত্রী একটা অভিশাপ"—রামদাসবাবু মাথা নাড়িয়া এই কথা কহিলেন।

"তাই কি? কেন?—কিসে?"—এই বলিয়া মিষ্টার বসু হাসিলেন।

রা। তবে ধরুন্; প্রথমতঃ, তা'রা বড় ব্যয়বহুল।

বসু। কোন্ বিষয়ে?

রা। অনেক বিষয়েই অনেক ব্যয় কর্‌তে হয়, তাদের জন্তে।—শিক্ষিতা স্ত্রীর হাল্ 'ফ্যাশানে'র সৌখীন পোষাক অন্ততঃ মাসে একবার নূতন হওয়া চাই; তা'র 'পাউডার' চাই, 'পমেটম' চাই, সাবান চাই, ক্রিম চাই, ল্যাভেণ্ডার চাই, নানাপ্রকার সুগন্ধি এসেন্স চাই। তারপর হাওয়া খেতে 'মোটর কার' চাই, 'এয়ারোপ্লেন'—'সবমেরিন' সবই চাই।

বসু। আরও কিছু?

রা। আচ্ছা, আপনি যদি এইভাবে আমাকে বাধা দেন, তবে কিছু বল্‌বো না।

বসু। ক্ষমা কোর্‌বেন ম'শায়! আমি আপনাকে বাধা দিচ্ছি না; কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা কর্‌ছেছি—তারপর?"

রা। শুনুন্, তা'র হারমোনিয়ম চাই, পিয়ানো চাই; সেতার, এসরাজ, বেঞ্জো, বেহালা কত কি চাই! কাজের মধ্যে তিনি প্রেমসঙ্গীত গাইবেন, আর কেবল বাজে গল্প করে, সভাসমিতিতে গিয়ে সময় কাটাবেন। এই জন্তে আমি, ম'শায়, শিক্ষিতা স্ত্রী মর্ম্মে মর্ম্মে অপছন্দ করি।

বসু। তবে আপ্‌নি বলতে চান্ যে, পরিণীতা স্ত্রীটির বিনা মাইনের নির্ব্বাক্ চাকরাণী হওয়া উচিত?

রা। না হে, ম'শায়, তা নয়, সে কথা কে বলে?"

বসু। কিন্তু আপ্‌নি এখুনি বল্লেন যে, আপনি শিক্ষিতা স্ত্রী পছন্দই করেন না।

রা। না, না! আমার বল্‌বার সে অর্থ নয়! আমি বল্‌ছি, স্কুল-কলেজে পড়া স্ত্রী" ভাল নয়। আমি মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে নই।

বসু। আহা! তাই বলুন না কেন? আপনি যে নিজের সীমা সংকীর্ণ করে ফেল্‌চেন!—বলুন ত, কলেজে পড়া সকল মেয়েরাই অপরিমিতব্যয়ী?"

রা। হাঁ, প্রায় সকলেই বটে!

বসু। তবে বলুন, আপনি তাদের মধ্যে কতজনকে জানেন?

রা। জানি, এই দু' একজন।

বসু। ওঃ! তবে আপনার এ বিষয়ে জ্ঞানের ভিত্তিই স্থাপিত হয় নি। ব্যক্তি-বিশেষের অভিজ্ঞতার উপর—?

রা। না না, ঠিক্ তাই নয়। আপ্‌নি যে কোনও শিক্ষিত ভারতবাসীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন্, সে আমার মতের সমর্থন কর্‌বে।

বন্ধু। হাঁ, সে খুব কম; অৰ্দ্ধেকের অৰ্দ্ধেক। আপনি বল্‌ছেন, "যে কোনও শিক্ষিত ভারতবাসীকে।" আচ্ছা, আমি একজন শিক্ষিত ভারতবাসী। কৈ, আমি ত সমর্থন কর্‌ছি না! আর আমার স্ত্রীকে ত আপ্‌নি জানেনই! তিনিত একজন গ্রাজুয়েট? কিন্তু কৈ তিনি কখনও ত প্রতিমাসে—এমন কি প্রতিবৎসরেও বহুমূল্য পরিচ্ছদ বা অলঙ্কারের প্রার্থনা করেন না! অথবা 'মোটর কারে'র জন্ত আব্‌দারও করেন না। বরং আমার সংসারের তিনি এমন সুব্যবস্থা করে চালান, যাতে আমি—।" পত্নী-গুণমুগ্ধ বন্ধু-মহাশয়ের পত্নীর গুণব্যাখ্যা রামদাসবাবুর আর সহ্য হইল না। তিনি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "আপনার কথা ছেড়ে দিন! ও রকম সকলের হয় না। কিন্তু তথাপি শিক্ষিতা স্ত্রী নিয়ে সংসার করা বহু-ব্যয়-সাপেক্ষ।

বন্ধু। কোন্ কোন্ বিষয়ে বলুন?

রা। সকল বিষয়েই।

বন্ধু। অনুগ্রহ ক'রে স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করুন, দেখি।

রা। শিক্ষিতা স্ত্রীরা আয় অপেক্ষা অনর্থক ব্যয় অধিক করেন।

বন্ধু। কেন? শিক্ষার গুণে কি তাদের আয়-ব্যয়ের জ্ঞানের অভাব ঘটে? তারা কি আপন স্বামীর ধন-সকল ছড়িয়ে উড়িয়ে নষ্ট করে ফেলে দেয়? শ্রমশ্রান্ত শরীর-মনকে মধ্যে মধ্যে নির্দ্দোষ আমোদ-আহ্লাদে প্রফুল্ল করার জন্ম সঞ্চিত দু'এক পয়সা খরচ কর্‌লে বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরং লাভ আছে;—কর্ম্ম-ক্ষেত্রে মন বসে ভাল। তোমরা 'থিয়েটার' যাবে, 'বায়স্কোপে' যাবে, স্বাধীনভাবে, সংসারের যেখানে যে আনন্দটুকু আছে, সে সকল অবাধে ভোগ কর্‌বে, আর নিজ-পক্ষ-রক্ষার জন্তে বল্‌বে পুরুষ-মানুষের এত কর্ম্ম-ময় জীবনে ক্লান্তিদূর আর আরামের জন্ম এ সকল চাইই। কিন্তু তোমার সঙ্গে সমান সুখ-দুঃখের ভাগী, সাংসারিক কাজে অশ্রান্ত পরিশ্রমী, একই ভাবে যার সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কাটে, তোমার সেই সৌখশায়নিকী স্ত্রীর আনন্দ উপভোগের জন্ম কি রাখ? একটু আমোদ আহ্লাদ উপভোগ কর্‌লে, একটু সুশিক্ষা পেলে অনেক সময় তার চিন্তভার লঘু হয়। তুমি তাতেও খড়্গহস্ত! তুমি কি তাকে একটি কলকারখানার জড় পদার্থের, বা ক্রীত-দাসীর মত রাখ্‌তে চাও? তুমি দেখছই, আমি আমার নিজের স্ত্রীকে 'বায়স্কোপ' প্রভৃতি সব দেখিয়ে আনি, মধ্যে মধ্যে।

রা। না, না। আমি তোমাকে উদ্দেশ্য করে বল্‌ছি না। আমি সাধারণের কথা বল্‌ছি। আমাদের সমাজের বিশৃঙ্খলা দেখে।

বন্ধু। সব সময় স্ত্রীকে অন্তত্র নিয়ে গিয়ে আমোদ দিবারই বা কি আবশ্যকতা? তিনি নিজের ঘরেই যথেষ্ট আমোদ পেতে পারেন। আর বাহিরে মেয়েদের যাওয়াও সকল সময়ে হিতকর নয়! তাকে বাড়ীতে বসে নিজের ঘরে গান-বাজ্‌না প্রভৃতি কর্‌তে দাও, উপদেশপূর্ণ পুস্তকের সাহায্য দাও, লেখা-পড়া কর্‌তে দাও, নিজে তার শিক্ষার সাহায্য করে দাও, তার সঙ্গে উন্নতি-বিষয়ে আলোচনা কর, তা'হলেই দেখ্‌বে তার শরীর ও মনের

উন্নতি হবে, সে অনেক আনন্দ পাবে; সর্ব্বদাই প্রফুল্লমুখী থাক্‌বে।

রা। হাঁ, হাঁ, আমি স্বীকার করি, আপনি যা বল্‌ছেন। কিন্তু কিন্তু —।

বন্ধু। না, আর কোন কিন্তু নেই এর মধ্যে। আপনি যে ঠিক্ Goldsmithএর সেই গ্রাম্য পাঠশালার স্কুলমাষ্টারের মত, পরাস্ত হয়েও হচ্ছেন না; তর্ক বজায় রাখ্‌তে চাচ্ছেন। হাঃ হাঃ!

রামদাসবাবু নিরুপায় হইয়া পলায়ন করিবার মানসে বলিলেন, "আচ্ছা, মিষ্টার বসু, আপনাকে নমস্কার। আমার এখন একটা বিশেষ দরকার আছে; আমি চল্লুম্।

বন্ধুকে চলে যেতে দেখে, মিষ্টার বসু তখন অপ্রতিভের হাসি হেসে অগত্যা উঠে দাঁড়ালেন।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

স্নিগ্ধ আলোকে ভরিয়া হৃদয়,
প্রকাশিল ঐ দ্বিতীয়া-রবি;
উদিলা বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে
ভাই-ভগিনীর মিলন-ছবি!
জাগো এবে ত্রিশ কোটী নরনারী!—
সাদর আগ্রহ ভগিনী-পরাণে।
সারা বরষের আনন্দ হরষ
ফুটিয়া উঠুক্ ভ্রাতার কল্যাণে!
হে শুভ দ্বিতীয়া-লগন আজিকে,
অভিষেক তব আমাদের ঘরে।
সুগন্ধ চন্দনে শিশির-কুঙ্কুমে
পবিত্র প্রসূন কোমল হারে।
তোমার স্নেহের চরণ-পরশে
আসুক্ সম্পদ্ আসুক শান্তি।
দূর করে দাও হিংসা-দ্বেষ যত,
মলিনতা-ভরা বিষাদ-ভ্রান্তি।
আন হে আনন্দ তোমারি নামেতে,
তোমারি পূজায় হউক্ সিদ্ধি।
ভাই-ভগিনীর একতা-বলেতে
ভারতে আসুক উন্নতি-বৃদ্ধি॥

শ্রীসুনীতি দেবী।

পুণ্য-তীর্থ।

জগতে তীর্থের মাহাত্ম্য সকলেই অবগত। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকল জাতিই তীর্থ-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রোল্লিখিত ও বহুকাল হইতে শ্রদ্ধার সহিত লোক-মুখে বিবৃত সেই সকল তীর্থের নাম উচ্চারণ করিলে মানবের

মনোমধ্যে এক অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হয়! সেই সকল তীর্থে যাইবার জন্ত লোক ব্যাকুল হইয়া উঠে। অর্থব্যয়, শক্তিব্যয় স্বাস্থ্যক্ষয়, প্রভৃতি নানাবিধ বিপৎ-পাতের সম্ভাবনা থাকিলেও নরনারী তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইতে ক্ষান্ত হয়েন না। তীর্থ-স্থান ধর্ম্মে বিজড়িত, শ্রদ্ধায় আবৃত ও আগ্রহে মণ্ডিত। ইহা লোকের ধর্ম্মাকাশের ধ্রুবতারা। ইহা জীবনাকাশের স্বাতিনক্ষত্র; ইহার একবিন্দু জলে যাত্রীর মনে মুক্তা ফলে—মোক্ষ-ফল উৎপন্ন হয়।

তীর্থ-পর্য্যটন-বাঞ্ছা পাপীর মনে তাহার পাপ-মোচনের আশার সঞ্চার করে এবং ধার্ম্মিকের মনকে ধর্ম্মের আলোকে উজ্জল ও বিভাসিত করে। ইস্‌লাম জাতির তীর্থ মক্কা-মদিনা, ইংরাজ প্রভৃতি য়ুরোপবাসী-দিগের তীর্থ জেরুসেলাম এবং হিন্দুদিগের-তীর্থ কাশী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম, চন্দ্রনাথ, অবন্তিকা প্রভৃতি। এই সকল স্থানে যাইবার জন্ত ব্যক্তি-গণ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। আমাদিগের হিন্দুর গৃহে পূর্ব্বে কত নরনারী স্ত্রী, পুত্র, কন্তা, স্বামী, প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সুখময় সোনার সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া, সুকুমার শিশুদিগের স্বর্গ-জ্যোতি-বিভাসিত পবিত্র কোমল মুখ-কমলের সুন্দর হাস্যের ছটা ভুলিয়া, তীর্থে ধাবমান হইতেন। পথিমধ্যে শ্রমে ও অনাহারে শরীর শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও, জীবন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইলেও তীর্থ-ফল-লাভের আশায় তীর্থগামী ব্যক্তি তীর্থ-যাত্রা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। অস্মদ্দেশে যখন বাষ্প-শকটের সৃষ্টি হয় নাই, তখন কত ব্যক্তি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে গমন করিবার পূর্ব্বে 'উইল'-পত্র সম্পাদন করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন। কিন্তু তথাপি এরূপ বিপৎ-সঙ্কুল তীর্থ-যাত্রা লোকে ভুলিতে পারিত না। কত তীর্থ-যাত্রীকে দস্যুদল পথিমধ্যে আক্রমণ করিত, যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত, এবং অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত হরণ করিয়া চলিয়া যাইত। তবুও তীর্থ-বিশ্বাসী তীর্থ-ফলাকাঙ্ক্ষী যাত্রী তীর্থের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিত না।

আমরা হিন্দু; আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিমগ্ন। আমরা পরমার্থ তত্ত্ব-নিরূপণে ব্যস্ত; সর্ব্বদাই ধর্ম্মের জন্ম লালায়িত। ধর্ম্মই আমাদিগের চরম বস্তু, পরম পবিত্র মহারত্ন। আমাদিগের দেশে যত ধর্ম্মালোচনা হয়, এমনটী জগতের আর কোথায়! আমরা খাইতে, শুইতে, উঠিতে বসিতে ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া থাকি। আমাদিগের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মই আমাদিগের ধন, মান, জ্ঞান ও প্রাণ—আমাদিগের জীবন-সর্ব্বস্ব। আমরা ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু-জাতি। ধর্ম্ম আমাদিগের জাতীয় মেরুদণ্ড, আমাদিগের গৌরব-নিশান। পুণ্যসঞ্চয় আমাদিগের জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য। স্বর্গ ও নরকের পার্থক্য আমরা বিলক্ষণ বুঝি। একটী কার্য্য করিবার পূর্ব্বে স্বর্গের পবিত্র সুখ ও নরকের দারুণ যন্ত্রণা আমরা কল্পনার চক্ষে যত দেখিয়া থাকি, হৃদয়ে যত জানি, এত আর কোন্ জাতি করে? আমরা যমদূত ও বিষ্ণুদূতের কথায় আলোচনা করি।

আমাদিগের দেশবাসী অতিশয় তীর্থ-প্রিয় এবং সর্ব্বদাই তীর্থ-গমনে লালায়িত হইলেও, তাঁহাদিগের স্ব স্ব গৃহ যে এক একটি পুণ্যক্ষেত্র তীর্থ-ভূমি, তাহা বোধ হয়, অনেকেই মনে ভাবেন না। এই তীর্থের জল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা, আকাশ, রবি, চন্দ্র, তারা সকলই পবিত্র, মনোহর, সুন্দর! এই তীর্থে কি না আছে? সকলই আছে। দয়া, মায়া, স্বার্থশূন্যতা, সহানুভূতি, পরোপকার, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সকলই আছে। ধর্ম্ম শিখিবার ও শিখাইবার এমন সুন্দর স্থান আর পৃথিবীতে, বুঝি, কুত্রাপি নাই। আমাদিগের এই গৃহ এক একটী আশ্রম ও তীর্থ। ইহাতে কত ধর্ম্মপ্রাণ মুনি ঋষি বাস করিয়া গিয়াছেন। ইহা কত রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মাদিগের পদার্পণে পবিত্রীকৃত হইয়াছে! এমন সুন্দর পবিত্র তীর্থ-চ্ছবি আর কোথায় আছে!

এই গৃহ-তীর্থে আকাশ হইতে উচ্চতর পিতা, এবং বসুন্ধরা হইতে গুরুতরা মাতার যিনি সেবার মত সেবা করিতে পারেন, তাঁহার কিসের ভাবনা? তাঁহার তীর্থফল হাতে হাতে। তাঁহাকে অধিক দূরে বাহিরে যাইতে হইবে না—গৃহে বসিয়াই পাইবেন। এ স্থানে "ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা" রূপ আজ্ঞা যিনি শিরে বহন করিতে পারেন, তিনি ধন্য;—তাঁহার মনের সুখ ও পুণ্য যথেষ্ট! যে জনক-জননী সুকুমার শিশুদিগকে স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া অন্নজ্ঞানাদি প্রদান করিয়া সুখ-সম্ভোগ করেন—তাহাদিগের বিমল আনন্দ—স্বর্গসুখ—পুণ্য-তীর্থের চরম ফল।

এই গৃহ-তীর্থের এক দেবতা স্বামী। স্বামি-সেবাই হিন্দু রমণীর প্রধান ধর্ম্ম। যিনি কায়মনোবাক্যে স্বামীর আরাধনা করেন, তিনি ইহ-পরকালে স্বর্গসুখ লাভ করেন। অস্মদ্দেশে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, চিন্তা, শৈব্যা, অরুন্ধতী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় রমণীগণ এই তীর্থের এক একটী আদর্শ স্থল। তাঁহাদিগের জীবনের দেব-জ্যোতি-বিকশিত আলেখ্যে প্রত্যেক হিন্দু-গৃহ সুসজ্জিত হওয়া আবশ্যক।

যে হিন্দুর পুণ্য-গৃহ সুন্দর শিশুদিগের প্রভাতকমলসদৃশ মুখকান্তিতে সুশোভিত, বালক-বালিকাগণের নির্ম্মল হাস্যে পরিপূর্ণ, আত্মীয় স্বজনের স্নেহময় মঙ্গল-বাক্যে আনন্দযুক্ত, দাস-দাসীগণের কোলাহলে প্রতিধ্বনিত, অতিথি-অভ্যাগতের আদর-আপ্যায়নে আনন্দিত, জনক-জননীর স্নেহ সম্ভাষণে মুখরিত, স্বামি-স্ত্রীর সোহাগবচনে প্রফুল্লিত, তাঁহার তীর্থস্থান আর কোথায়?

মানবের গৃহই তাঁহার তীর্থস্থান। তথায় তিনি সুন্দররূপে ধর্ম্মালোচনা করিতে পারিলে তাঁহার সমস্ত তীর্থ-কামনা পূর্ণ হইবে। তাঁহার গৃহই তাঁহার পুণ্য-তীর্থ। অন্যত্র গমন করিতে হইবে না। তথায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই লাভ হইবে। যিনি এই, গৃহ-তীর্থের পুণ্যসলিলে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ও পবিত্রভাবে অবগাহন করিতে পারেন, তিনিই ধন্য! তাঁহার জীবন সার্থক।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

পরিতৃপ্তি।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে)

কেন বৃথা কর অনুরোধ,
শিশুটী কি পেয়েছ আমায় ?
কা'র মিটে প্রবল তিয়াসা
'আঙ্গুর' 'আনার' 'বেদনায়' ?

সারা প্রাণে জলিলে অনল
ধূ ধূ ধূ ধূ রাবণের চিতা,
নাহি বল, নাহি যে অভয়,
চিন্তা-ভারে রহি ক্লান্ত ভীতা!

শূন্য মোর হৃদয়-মন্দিরে
যবে হবে পূজা-আয়োজন,
দেবতারে অরঘ সঁপিয়া
দূরে যাবে তিয়াসা ভীষণ।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

অদৃষ্ট-লিপি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে অনেক দিনের কথা। কলিকাতায় —নং কলেজ ষ্ট্রীটে, রমাকান্ত ঘোষ, এল, এম্, এস্-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাড়ীটি বেশ সুন্দর। উপরতলায় ডাক্তারবাবু সপরিবারে বাস করিতেন; নীচের তলায় ডিস্‌পেন্‌সারি ছিল। ডাক্তারের চেহারা পরম সুন্দর। লোকে তাঁহাকে ধার্ম্মিক, চরিত্রবান, মিষ্টভাষী বলিয়া জানিত। সকলে মনে বুঝিত ডাক্তারের চিকিৎসা-বিদ্যায় যেমন অভিজ্ঞতা, হাতযশঃও সেই রকম। এ-রকম লোকের প্রসার-প্রতিপত্তি হইতে বেশী দিন লাগে না। অল্প দিনের মধ্যেই রমাকান্তের অর্থ ও যশঃ অর্জ্জিত হইতে লাগিল।

কিশোর বয়সেই রমাকান্ত মাতাপিতৃহীন হইয়া, পৈত্রিকভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থদ্বারা বিদ্যাশিক্ষা করেন। এখন পরিজন বলিতে, একমাত্র ভার্য্যা ভুবনেশ্বরী। ভুবনেশ্বরীও মাতাপিতৃহীনা। তাহার পিতৃকুলে কেবল অগ্রজ গোপীনাথ এবং ভ্রাতৃজায়া মোহিনী ছিলেন। শ্বশুরকুলে স্বামী ভিন্ন অন্য কোনও আত্মীয় ছিল না। অতএব বালিকা-বয়স হইতেই ভুবনেশ্বরী তাহার হৃদয়পূর্ণ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও মমতারাশি তাহার স্বামীর চরণে অঞ্জলি দিল। সে-দান রমাকান্ত যেমন সাদরে গ্রহণ করিলেন, তেমনি সাগ্রহে প্রতিদানও করিলেন। এমনি সুখের দিনে তাঁহাদের একটী পুত্র-সন্তান জন্মিল।

সেবারে আষাঢ় মাসের প্রথমে পুরীধামে রথযাত্রা দেখিতে রমাকান্তের বন্ধুবান্ধবেরা অনেকে ইচ্ছুক হইলেন। কয়জনে রমাকান্তকে তাহাদের সঙ্গী হইবার জন্য চাপিয়া ধরিলেন। রমাকান্তের দেশ-ভ্রমণের সাধ চিরদিনই প্রবল। বন্ধুগণের আগ্রহাতিশয্যে তাহা আবার প্রবলতর হইয়া উঠিল। তাই একদিন পত্নীর হাতে ধরিয়া, দুই-বৎসরের পুত্র সুধীরকে চুমা খাইয়া, ধীরে ধীরে শ্রীক্ষেত্রে যাইবার প্রস্তাব করিলেন।

শুনিয়াই ভুবনেশ্বরীর বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। দূরদেশে যাওয়া; অসুখ-সম্ভাবনা, শুশ্রূষার ত্রুটি—পলকের মধ্যে এমনি কত কথা তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় খেলিয়া গেল। আসল কথা, সে তাহার স্বামীকে—সে তাহার একমাত্র সুহৃদ্, একমাত্র আত্মীয় স্বামীকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে পারে না। কিন্তু ওঁর যখন পুরীতে যাইবার এত আগ্রহ, তখন তাহাতে বাধা দেওয়াও বড় স্বার্থপরের কাজ। স্বামীকে একবিন্দু দুঃখ দিতে ত সে পারে না। তখন শ্রীক্ষেত্রযাত্রী বন্ধুবান্ধবদিগকে মনে মনে গালি দিতে দিতে, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, সাধ্বী সলজ্জভাবে বলিল, "তা তুমি যদি যাও, তবে আমাদেরও নিয়ে চল। তোমায় ছেড়ে থাকা যায় না"। কথা শুনিয়া রমাকান্ত যেমন প্রীত তেমনি ব্যথিত হইলেন। পত্নীকে খুব আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমায় কি ছেড়ে থাকা যায়; লক্ষ্মি? তোমার তবু দাদা আছেন, বৌদি আছেন। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বল দেখি? এ জগতে আমার ভালবাসিবার যদি কিছু থাকে, তবে সে তুমি; আমার যদি 'আমার' বলিতে কিছু থাকে, তবে সে তুমি। তোমায় ছেড়ে আমি কয়দিন থাকৃতে পারি বল ত? তুমি আমার উপরে রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি আমার! আমরা বজ্রায় চ'ড়ে যাব। তাতে তোমার আর খোকার যাওয়ার সুবিধে হবে না। শুনচি ওদিকে শীঘ্র রেল খুল্‌বে। তখন তোমাদের নিয়ে আবার বেড়া'তে যাব।"

তথাপি পত্নীর ম্লান মুখ এবং ছল-ছল চক্ষু দেখিয়া রমাকান্ত আবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমার জন্যে কিছু ভেব না। তুমি ত ভগবানের চরণে নির্ভর কোরে থাকৃতে জা'ন। তাঁরই কৃপায় তোমরা ভাল থাকবে, আমি ভাল থাক্‌ব। প্রত্যহ আমি তোমায় চিঠি লিখ্‌ব। এই কয়টা দিনের জন্য তুমি কেন কাতর হোচ্ছ? তোমার হাসিমুখ না দেখ্‌লে স্বর্গে গিয়েও আমি আনন্দ পাব না। তুমি ত আমার মনের কথা জা'ন। আর দাদাকে তোমার কাছে রেখে যাব। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে তোমার বৌদিকেও নিয়ে এস।"

এই সব কথার পরে ভুবনেশ্বরী আর কিছু কাতরতা প্রকাশ করিল না। যথাসময়ে গোপীনাথ ভগিনীর অভিভাবক হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তপ্ত অশ্রু মুছিতে মুছিতে রমাকান্ত ও ভুবনেশ্বরী, পরস্পরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিল। [ক্রমশঃ]

শ্রীমা—।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

বঙ্গদেশ।—কালীঘাট।

কালীঘাট কলিকাতায় অবস্থিত। ইহার নিম্ন দিয়া পুতসলীলা গঙ্গাদেবী কলনিনাদে প্রবাহিতা। প্রবাদ এইরূপ যে, সতী দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিলে মহাদেব তাঁহার মৃত শরীর লইয়া উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মহাদেবকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত বিষ্ণু তাঁহার সুদর্শন চক্র-দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যে যে স্থানে সতীর দেহাংশ পতিত হইল, সেই সেই স্থান পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত হইল। কালীঘাটে সতীর একটি অঙ্গুলি পতিত হয়। সুতরাং এখানকার কালী অত্যন্ত বিখ্যাত। হিন্দুরা কালীকে পরব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া থাকেন। কালী-নামে ভগবানের কালস্বরূপা শক্তিকে বুঝায়। অথবা কাল-শব্দে সংহার, ও ঈকারে তৎকর্ত্রী; অর্থাৎ সংহার-কর্ত্রী। ইহাই কালী-নামের ব্যাখ্যা। যাঁহাতে সকলই লয় পায়, তাঁহাকেই কালী বলা যায়। ইনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা; তাই কালরূপে সকলের আদিতে বিদ্যমান ছিলেন। তৎকালে অন্য কোনও বস্তু ছিল না। সেইজন্য মনু "আসীত্তমোময়ং লোকমনর্কগ্রহতারকং" বলিয়াছেন। ইহাতে আমরা ইহাই বুঝি যে, পূর্ব্বে কেবল অন্ধকারময় লোক ছিল, সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপতি গ্রহ-তারকা কিছুই ছিল না। সুতরাং, সেই সময়কেই কালবাদীরা ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং, সেই কালস্বরূপ পরমাত্মা শক্তিযোগে কাল ও কালীরূপ প্রকাশে দুইরূপ হইলেন। শ্রুতিতেও আছে যে "স একাকী নরমেত, অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"। অনন্তর সেই কাল ত্রিবিৎকরণ-দ্বারা তিনগুণে ব্যাখ্যাত হইলেন; যথা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান; অথবা তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব। মোট কথায়, সৃষ্টিকাল, স্থিতিকাল ও নিধনকাল। সর্জ্জনকালের নাম রজঃ; সুতরাং ইহা ব্রহ্মরূপ। স্থিতিকালের নাম সত্ত্ব; সুতরাং ইহা পালনকর্ত্তা বিষ্ণুরূপ। সংহারকালের নাম তমঃ; সুতরাং রুদ্ররূপ। এই রুদ্রের নাম কালাগ্নি। অতএব কালী বলিলে হিন্দু ব্রহ্মকেই বুঝেন।

কালীর তিনটী গুণকে তিনটী চক্ষু বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোথাও বা "চন্দ্রার্কানললোচন" ও বলিয়াছেন। এই সত্ত্বগুণ সোম, রজোগুণ রবি এবং তমোগুণ অগ্নি। তাই কালীর অন্য একটী নাম ত্রিগুণা; অর্থাৎ তিনিই আদ্যা সমস্ত-জগৎ-প্রকাশিকা, সমস্ত জগৎ-পালিকা এবং সমস্ত জগৎ-বিনাশিকা। সূর্য্যে উৎপত্তি, চন্দ্রে স্থিতি ও অগ্নিতে বিনাশ দেখা যায়। জীব-শরীরেও আমরা দেখিতে পাই, শোণিতে উৎপত্তি, শুক্রে স্থিতি এবং অগ্নিতেই লয়। এই শোণিত রজোরূপী সূর্য্য, শুক্র সত্ত্বরূপী চন্দ্র এবং রুদ্রস্বরূপ তমোরূপী কালাগ্নি। যে কালাগ্নি-দ্বারা জীব লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই কালী-নামে অভিহিতা।

পরব্রহ্মের নিকটে যাবতীয় বস্তু, কিছুই

অগোচর নহে। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালকেই দেখিতেছেন। এইজন্য কালী ত্রিনয়না। জীবমাত্রেই কাল-দ্বারা বিনষ্ট হয় বলিয়া জীব কালের হারস্বরূপ। তাই নানাবর্ণের নরমুণ্ড কালীর কণ্ঠভূষণ।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় শ্রুতিই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। সুতরাং, কালীর কর্ণদ্বয়ে দুই শিশু সংলগ্ন আছে। শাস্ত্রে অর্দ্ধচন্দ্রচ্ছলে অর্দ্ধমাত্রাকে নাদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাই কালরূপ কালী নাদরূপে পরিণতা। সেই নাদই অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেদের শিরোভাগে অবস্থিতি করেন। এ-কারণ, কালী প্রণব-স্বরূপা। কালীকে কেহ কেহ দন্তুরা ও বলেন; অর্থাৎ কালের দংষ্ট্রে সকলেই অবস্থিত। ইনি আলোল-রসনা শব্দেও অভিহিত হয়েন। এই শব্দ দ্বারা আমরা ইহাই বুঝি যে, জিহ্বার নাম রসজ্ঞা। আত্মার সত্তাতেই জগতের যাবতীয় রসাস্বাদন হইয়া থাকে। বাহ্যেন্দ্রিয়ের রসাস্বাদনে কোনও ক্ষমতাই নাই। তাই চৈতন্যস্বরূপ আত্মার আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এ-কারণ, কালী জিহ্বা বিস্তার করিয়া আছেন; অর্থাৎ তিনি 'আমিই সমস্ত রসের আস্বাদনকর্ত্রী, আমার সত্তাতেই জীবের রসবোধ হইয়া থাকে' ইহাই জানাইতেছেন।

কালী মুক্তকেশী। কেশ-শব্দে মায়াজাল। পরব্রহ্ম হইতে মায়া অবতীর্ণা হইয়া জগৎকে আচ্ছাদন করে বলিয়া, মুক্তকেশী-শব্দে ইহাই বুঝায় যে, কালীর স্বরূপ-বেত্তা জীবের মায়া-পাশ হইতে পরিমুক্ত হয়। এই কারণেই কালীকে মুক্তকেশী বলা হয়।

কালী চতুর্ভুজা। শাস্ত্রে পুরুষার্থ চতুষ্টয় ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকে বলে। তাই এই চারিটী কালীর হস্ত। যে হস্তে বর সেই হস্তই ধর্ম্মস্বরূপ। যে হস্তে অসি তাহাই অর্থ। রাজ্যলাভেই সম্যক্ অর্থের লাভ হয়। বিনা অসি রাজ্যজয় হয় না। সুতরাং যুদ্ধার্থে জীবকে শস্ত্রপাণি হইতে হইবে। যে হস্তে মুণ্ড সেই হস্তই কাম অর্থাৎ অভিলাষ। বিনা শত্রু-নিপাতে অভিলাষ পূর্ণ হয় না। যে হস্তে অভয় সেই হস্তই বিশুদ্ধ মোক্ষ। যে পর্য্যন্ত জীব মোক্ষলাভ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহার ভয় দূর হয় না। কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা ভয়হীন! এই জন্য কালীর অভয়প্রদ হস্তকে চতুর্ব্বর্গের শেষবর্গ মোক্ষস্বরূপ কহা হইয়াছে।

কালী দিগম্বরী। সর্ব্বব্যাপক কালের পরিধি নাই; সুতরাং চারিদিক্‌কেই আচ্ছন্ন করিয়া আছেন।

কালীর চরণতলে শবরূপে কালের অবস্থিতি। কাল শব্দে মৃত্যু। সেই মৃত্যু যে শক্তিতে পরাভূত হইয়া শববৎ পতিত আছে, তাহাই ব্রহ্মস্বরূপা কালী।

কুলা কুরুল্লাদি অষ্ট নায়িকা অষ্টসিদ্ধিরূপে ব্রহ্মরূপা কালীর পরিচর্য্যা করেন। ইহা-দ্বারা বুঝা যায় যে, পরব্রহ্মের পরিচারিকা অষ্টসিদ্ধি। শমদমাদি অষ্টাঙ্গযোগই অষ্ট নায়িকা। এইগুলিই লোকদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করে।

কালীঘাটে কালীর যে মন্দির দেখা যায়, তাহা ৩৩০ বৎসরের পুরাতন। বরিশার সাবর্ণ চৌধুরীর দ্বারা মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি মন্দির-পরিচালনার জন্য ৩৮৮ বিঘা জমী দান করেন। চণ্ডীচরণ-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মন্দিরের প্রথম ব্রাহ্মণ নিযুক্ত

হ'ন। তাঁহার বংশধরগণ হালদার-নামে খ্যাত। ইহারাই মন্দিরের মালিক। দুর্গা-পূজার অষ্টমীর দিন কালীঘাটে আড়ম্বরপূর্ণ পূজাদি হইয়া থাকে।

তীর্থসেবিগণ কালীঘাট-দর্শন করিয়া সন্নি-কটবর্ত্তী নকুলেশ্বরের দর্শন করেন। [ক্রমশঃ]

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জল Hydrogen বা উদজান এবং Oxygen বা অম্লজানের মিশ্রণে উৎপন্ন বস্তু। এই দুইটি জিনিষ মিশে একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য হয়ে গেছে। জল কখনও স্থির থাকে না, জল সর্ব্বদা নিম্নগামী, নীচের দিকে যায়; এবং নানা-স্থানে ফিরে ঘুরে শেষে সমুদ্রে পড়ে। জলের স্রোত জমির উপর এবং ভিতর দিয়া চলে। ভিতরের জলকে চোয়ান জল বলে। জল এইরূপ গতিশীল না হইলে আমাদের বড়ই কষ্ট হইত।

জলের মূল ভাণ্ডার সমুদ্র। সমুদ্রের জল নিতান্ত লোণা। মানুষ ইহা ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু সমুদ্রের জল এরূপ লোণা না হইলে, নষ্ট হইয়া যাইত। বিধাতা জল পরিষ্কার করিবার জন্য অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেছেন। তাঁহার বকযন্ত্র চোয়ানের কল অহর্নিশ চলি-তেছে। সমুদ্র হইতে সূর্য্যের তাপে যে বাষ্প উঠে, তাহাতে লবণ কিম্বা অন্য কিছু জিনিষ থাকে না। সেই বাষ্প আকাশের উপর শীতল স্থানে গিয়া মেঘের আকার ধরে এবং এই মেঘ একত্র ও ঘন হয় এবং তাতে ঠাণ্ডা লাগিলে বৃষ্টি হয়। পৃথিবীর উপরে যেখানে যত প্রকার জল আছে এবং জড় উদ্ভিদ্ ও জীবদেহে যে জল আছে, সে সমস্ত হইতেই বাষ্প উঠে। হিমালয় বা অন্যান্য শীতল পর্ব্বতে জলীয় বাষ্প বরফের আকার ধারণ করে এবং সূর্য্যতাপে সেই বরফ গলিয়া নানা আকার ধরে। প্রস্রবণ, নদ,নদী প্রভৃতি নানা-প্রকারের জলস্রোত হয়। নদী, প্রস্রবণ, হ্রদ আমাদের প্রধান জল-ভাণ্ডার। তা'ছাড়া পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিয়া জমির ভিতরের স্রোত হইতে জল উঠাইয়া লইয়াও আমরা ব্যবহার করি। পুষ্করিণী ও কূপ যথেষ্ট পরিমাণে গভীর না হইলে তা'র জল স্বাস্থ্য-কর হয় না। জমির উপরিভাগের মাটির তলায় এঁটেল মাটি আছে। সেই মাটিকে ভেদ করিয়া percolation (চোয়ান) এর জল যাইতে পারে না।

এই এঁটেল মাটি ভেদ করে জল আনিলে

জল স্বাস্থ্যকর হয়, সেইজন্য কূপ এবং পুষ্করিণী ততটা গভীর করিতে হয়।

পুষ্করিণী এবং কূপের জল পরিষ্কার রাখিবার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হয়। কারণ, জলের মধ্য দিয়া নানাপ্রকার রোগ-বীজ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। আমাদের স্থানীয় পানীয় জল বিশেষভাবে পরিষ্কার হওয়া চাই। পানীয় জল প্রথমে ফটকিরি বা নির্ম্মলী ফল দিয়া পরিষ্কার করিয়া দশ মিনিট ফুটাইয়া লইলে অনেকটা দোষ কেটে যায়। ফটকিরি অনেক প্রকার বীজ নষ্ট করে; কিন্তু ইহার পরিমাণ বেশী হইলে জল বিস্বাদ হয়।

জল আমাদের কি উপকার করে? জল ব্যতীত কোন জীব বা উদ্ভিদ্ বাঁচিতে পারে না। আমাদের শরীরের ওজনের প্রায় বার আনা অংশ জল। তা'র অল্প অংশই আমরা খাদ্য হইতে পাই। তাহার অধিকাংশই জল ও অন্যান্য পানীয় দ্রব্য হইতে পাই। জল ব্যতীত আমাদের kidney বা মূত্রাধার এবং অন্যান্য যন্ত্র কাজ করিতে পারে না, ঘাম ভালরূপে নির্গত হইতে পারে না, ত্বক্ (চামড়া) শুষ্ক ও অপরিষ্কার হয়। জল অভাবে আরও অনেক প্রকার অনিষ্ট হয়। উদ্ভিদ্ ফল মূল নানাপ্রকার আনাজ জন্মায় না। সেজন্য অন্ন-কষ্ট ও দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে অনেকেরই কষ্ট এবং কাহারও বা মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়।

স্বাভাবিক বৃষ্টির জলেই প্রায় সকল প্রকার ফসল রক্ষা করে। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে খাল (canal)-দ্বারা নদী ও পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া ছোট ছোট নালা-দ্বারা ক্ষেতে জল দেওয়া যায়। এইরূপ জল দেওয়াকে Irrigation 'ইরিগেসন' বলে।

আমাদের দয়ালু গবর্ণমেন্ট (সরকার-বাহাদুর) লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া জল-প্রণালী, করেছেন। তদ্দ্বারা নানা স্থানের কৃষিকার্য্য চলে। এইরূপ না করিলে কত লোকের কত কষ্ট হইত। ইংরাজ-রাজ্যে প্রজার সুখ-সুবিধার জন্য কতই ব্যবস্থা আছে। সে সমস্ত জানিলে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া থাকা যায় না।

জলের আমাদের কতই প্রয়োজন! দেহ গৃহ, কাপড়, বাসন, প্রভৃতি জল ব্যতীত কি পরিষ্কার হয়? তৃষ্ণায় জলপান এবং ক্লান্ত উত্তপ্ত শরীরে স্নান করিলে যে কত সুখ ও আরাম হয়, তা কি একমুখে বলা যায়!

কে ভাঙ্গিতে পারে তৃষ্ণা শুখাইলে মুখ,
স্নানের সময় এত কেবা দিত সুখ!
জল বিনা একদণ্ড বাঁচিতে না পারি,
দয়াময় হরি তাই সৃজিলেন বারি।

শ্রীরাজমোহন বসু।

সাধুবচন-সংগ্রহ।

১। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে যিনি সহায় করিয়াছেন, ও তাঁহার উপরেই যাঁহার সকল আশা ভরসা, তিনিই সুখী।

২। চিজ্ঞেয়োঽক্ষরসন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্। বিহায় শব্দশাস্ত্রাণি যৎসত্যং তদুপাস্যতাম্॥ সন্মাত্র অক্ষর বস্তুই বিশেষরূপে জানিবার যোগ্য, জীবনও চঞ্চল। সকল শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া, যাহা সত্য, তাহাই অবলম্বন কর।

৩। কবির শ্বাস সুফল সোই জানিয়ে,
হরিকা সুমিরণ লায়ে।

কবির বলিতেছেন, সেই শ্বাসই সফল জানিও, যে শ্বাস হরি-স্মরণেতে লাগিয়া যায়।

৪। কবির গোবিন্দ্‌কে গুণ গাওতে,
কভু না কিযিয়ে লাজ্।

কবির বলিতেছেন ঈশ্বরের গুণগান করিতে কখনও লজ্জা করিও না।

৫। Sing unto the Lord with thanks-giving: sing praise upon the harp unto our God:

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রভুর গুণগান কর, বীণাবাদনপূর্ব্বক আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা গান কর।

৬। অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে-ব্যক্তি শ্বপচ (চণ্ডাল) হইলেও কেবল সেইজন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তপস্যা করেন, তাঁহারাই হোম করেন, তাঁহারাই তীর্থস্নান করেন, তাঁহারাই আর্য্য (সদাচারী), এবং তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করে।

৭। কবির সোণা রূপা কাল হায়, কঙ্কর্ পাথর হীর্। এক্ নাম মুক্তামণি, তাকো জপহি কবির।

কবির বলিতেছেন, সোনা-রূপাই কাল; হীরা কাঁকর পাথর। এক নামই আমার মুক্তামণি; তাহাকেই কবির জপ করেন।

৮। সংসার আরতি করি মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করি ভব তরিবারে॥
(চৈতন্যদেব)।

৯। সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধর্ম্মকে অন্বেষণ কর, তাহা হইলেই তোমার সকল অভাব পূর্ণ হইবে ও অভাবের অতিরিক্ত দান পাইবে।

১০। কবির হরি-রস্ এয়ো পিয়া, বাকি রহিম ছাক।
পাকা কলস্ কোঁ ভারকা, বহুরি চড়ে নহি চাক।

কবির বলিতেছেন, হরিরস যে একবার পান করিয়াছে, তাহার আর কোনও রসের সখ্ থাকে না; যেমন পোড়া কলসী পুনরায় আর কুমারের চাকে চড়ে না।

১১। কবির কহৎ শুনৎ জগ্ যাৎ হায়,
বিথয়ন্ সুঝে কাল।
কহেঁ কবির রে প্রাণিয়া!
বাণি ব্রহ্ম সঁভাল।

কবির বলিতেছেন, কহিতে কহিতে শুনিতে শুনিতে জগৎ চলিয়া যাইতেছে, বিষয়রূপ বিষে কালকে দেখিতে দিতেছে না। কবির তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, "রে প্রাণিগণ! ব্রহ্মের বাক্য সাম্‌লাও, অর্থাৎ ধরিয়া রাখ।"

তপস্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

নিদাঘের অপরাহ্ণ। প্রখর রবি সারাটি দিন ধরণীকে দগ্ধ করিয়া, বৃক্ষলতা-সকল ঝলসাইয়া দিয়া, পথিকের শিরে অগ্নিবর্ষণ করিয়া এইবার ক্লান্তভাবে পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মধুমতী-তীরে ঝাউ ও বটবৃক্ষের শাখায় বসিয়া বায়স উচ্চ চিৎকারে দিগন্ত মুখরিত করিতেছে; অন্যান্য পক্ষিকুলও স্ব স্ব রবে সন্ধ্যার আগমনী গাহিতেছে। নদীবক্ষে তরণী-সকল আরোহী লইয়া ধীর-মন্থর গতিতে গমনাগমন করিতেছে। দূরে বাষ্পীয় লৌহ-শকটের বংশীধ্বনি শ্রুত হইতেছে। তন্মধ্যস্থিত আরোহিগণের অস্পষ্ট আয়তন গবাক্ষ-পথ দিয়া দেখা যাইতেছে। এরূপ সময়ে নদী-তীরে বসিয়া হরনাথবাবু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছিলেন।

দেখিতে দেখিতে বায়ুকোণে একখণ্ড মেঘ দেখা দিল। পথের ধূলা উড়াইয়া বাতাস মেঘের সঙ্গে ছুটিল। পল্লী-বালক-বালিকাগণ ডালা-চুপ্ড়ি হস্তে লইয়া আম কুড়াইবার জন্য বাতাস ঠেলিয়া ছুটিল। তখনও বৃষ্টি পড়ে নাই; শুধু বাতাস বহিতেছিল। হরনাথবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া গৃহে ফিরিবেন কি-না, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় বাতাস ঠেলিয়া দ্রুত-পাদবিক্ষেপে সহাস্য আস্যে একটী ষোড়শ বৎসরের বালক আসিয়া একখণ্ড কাগজ হরনাথবাবুর হস্তে দিয়া বলিল, "বাবা, আমি 'পাস' হয়েছি; 'ফার্ষ্ট' হয়েছি। এই দেখুন, কাকা 'টেলিগ্রাম' করেছেন।" এই বালকটি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সুধীর; আর তাহার কাকা, হরনাথ-বাবুর জনৈক প্রতিবেশী; গ্রাম-সম্বন্ধে হরনাথ-বাবুর ভাই হ'ন্।

সুধীর 'টেলিগ্রাম'-খানি হরনাথবাবুর হাতে দিলে হরনাথবাবু তাহা দেখিবেন কি! আনন্দাশ্রুতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। আর অলক্ষ্যে বক্ষ ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘশ্বাসও যে না বহিয়াছিল, তাহা নহে! হায়, রাজ লক্ষ্মি, আজ তুমি কোথায়? তোমার কত তপস্যার ধন সুধীর আজি প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে! —কত ধনাঢ্যের সন্তানকে অতিক্রম করিয়া দরিদ্র বালক আজি তাহাদের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে! এ সুখের অংশ গ্রহণ করা রাজলক্ষ্মীর ভাগ্যে নাই! তাই আজি হরনাথবাবুর এ আনন্দ-সংবাদেও দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিয়াছিল; আনন্দাশ্রুর সঙ্গে সঙ্গে একবিন্দু শোকাশ্রুও ঝরিয়াছিল!

সুধীর বলিল, "'টেলিগ্রাম'-খানা পড়ে দেখুন না বাবা!" তখন হরনাথবাবুর চিন্তা-স্রোত রুদ্ধ হইল। তিনি 'টেলিগ্রাম'-খানায় চক্ষু বুলাইয়া বলিলেন, "হাঁ—বাবা, পড়েছি। এখন চল, মা কালীর বাড়ী পূজা দিয়া আসি।" তখন হরনাথবাবু গ্রাম্য কালী-মন্দিরে গিয়া পুত্রের মঙ্গল-কামনায় কালীর পূজা দিয়া আসিলেন।

যথাকালে গেজেট বাহির হইল ; সুধীরের উচ্চবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। গ্রামের লোক ভাবিল, এছেলে কালে একজন 'কেষ্ট' "বিষ্ণু"-গোছ না হয়ে যায় না। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া সে এত বড় একটা হইয়া উঠিয়াছে ; বিদ্যালয়ও ইহাতে গৌরবান্বিত হইল !

সুধীরের বাসনা, সে বি-এ, এম্-এ পড়িয়া কালে একজন কৃতবিদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। হরনাথবাবুরও যে ইহা ইচ্ছা নহে, তাহা নহে ; তবে তিনি এক বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। এবার সুধীরকে এফ্.এ পড়িতে হইলে কলিকাতায় যাইতে হয়। কলিকাতা যাইলেই পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটিবে। একমাত্র নয়ন-মণি, অন্ধের যষ্টি, হৃদয়-নিধিকে প্রবাসে পাঠাইয়া তিনি কি প্রকারে গৃহে অবস্থান করিতে পারিবেন ? সুধীরকে ছাড়িয়া তিনি কিরূপে জীবনধারণ করিবেন ! কখনও বা তিনি মনে করিলেন, গৃহদ্বারে তালা লাগাইয়া তিনিও সুধীরের সঙ্গে কলিকাতায় বাস করিবেন। সুধীর ছাড়া তাঁহার কিসের সংসার ! কিন্তু আবার সে কথাটা যুক্তি-সংগত বলিয়া মনে হইল না। কারণ, গৃহ-ত্যাগ করিয়া যাইলে ঘর-দোর ত সব মাটী হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন বাগান-বেড় জায়গা-জমী যাহা আছে, তাহাও যে নষ্ট হইয়া যাইবে ! ফসল যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহাও আর পাওয়া যাইবে না। তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের তাহাই যে একমাত্র উপায় ! সুধীরও মনে মনে এইরূপ কত চিন্তা করিতে লাগিল। কখনও বা সে কল্পনায় পিতাকে ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর করিয়া তুলিত। আবার কখনও বা পিতৃ-বিরহজনিত আশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িত। বিদেশ বিভূমে একা সে কিরূপে থাকিবে ! সেখানে কে তাঁহাকে এমন স্নেহ যত্ন করিবে ? বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন-কালে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কে তাহার প্রতীক্ষা করিবে ? আর সেই-বা গৃহে ফিরিয়া কাহার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবে ? সেখানে ত বাবা নাই ! সে যে মাতৃহারা বালক ! পিতার অপরিসীম স্নেহই যে তাহার সমস্ত জীবনটী ভরিয়া রাখিয়াছে। পিতার ভালবাসাই যে তাহার জীবনের সম্বল ! পিতাকে ছাড়িয়া একা সে কিরূপে থাকিবে !

পিতা-পুত্র উভয়েরই যখন মনের ভাব এইরূপ, তখন কাজেই সুধীরের পড়িবার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অধিক দিন তাহার এ অবস্থায় গেল না। পিতা-পুত্র উভয়েরই যুক্তি-তর্ক খণ্ডিত হইয়া গেল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সুধীরকে একাকীই কলিকাতায় যাইতে হইল। হরনাথবাবুর জনৈক প্রতিবেশীর পুত্র কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। সে আসিয়া একদিন হরনাথবাবুকে বলিল, "আপনি স্নেহের আধিক্যে সুধীরের ভবিষ্যৎ নষ্ট কর্ব্বেন না। সুধীরকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন্ ; আমাদের সঙ্গে আমাদের 'মেসে' থাক্‌বে ; আমি তাকে দেখ্‌ব। আপ্‌নার কোনো ভাবনা নেই। আপনিও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আস্‌বেন। তা ছাড়া বছরে দু'বার 'কলেজ' বন্ধ হবে। পূজার বন্ধে, গ্রীষ্মের বন্ধে সুধীর দেশে আস্‌বে। আপনার ভাবনা কিসের ? এমন ছেলে যদি এই পল্লী-গ্রামে বসে থাকে, ওর ভবিষ্যতে উন্নতির আশা একবারে মাটী হয়ে যাবে।" অগত্যা হরনাথবাবু সম্মত হইলেন।

যাত্রার দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। পিতার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে সুধীর উক্ত প্রতিবেশীর সহিত কলিকাতায় যাত্রা করিল। পুত্রগতপ্রাণ হরনাথবাবু সুধীরের মুখ-চুম্বন করিয়া সাশ্রুনয়নে বিদায় দিলেন। হায়, এ হৃদয়নিধিকে মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষের অন্তরাল করিতে যে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, বুক চিরিয়া বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখেন। এই দুঃখময় জগতে অপত্যস্নেহ কি একটী স্বর্গীয় পদার্থ! ইহা নন্দনের পারিজাত, চন্দ্রের সুধা, সংসার-পীড়া উপশমের ধন্বন্তরি-হস্ত-নিঃসৃত অমোঘ ঔষধ। সন্তানের ন্যায় প্রিয় বস্তু এ সংসারে আর কিছুই নাই। বারংবার প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখিবার আদেশ দিয়া, হরনাথবাবু সুধীরকে বিদায় দিলেন! সুধীর সম্মতি-সূচক মস্তক সঞ্চালিত করিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে গমন করিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুত্রকে দৃষ্ট হইল, হরনাথবাবু ততক্ষণ একদৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন সুধীর অদৃশ্য হইয়া গেল, তখনও তিনি তেমনই ভাবে চাহিয়া রহিলেন! ভাবিলেন, ঐ বুঝি, গাছের ফাঁক দিয়া ঝোপের আড়াল হইতে পুত্রকে অস্পষ্ট একটু দেখা যাইতেছে! ঐ বুঝি, তাহার পরিধেয় বসনের কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছে! ঐ-ঐ বুঝি ওটা তাহার ছায়া!—না না, ও যে একটা গাছের ছায়া! সন্তানবৎসল উদ্‌ভ্রান্ত পিতা সংজ্ঞাশূন্য, নির্ব্বাক, নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় পথের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ধরণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; প্রকৃতিরাণী ধূসর-বসনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবৃত করিলেন;—আর কিছুই দৃষ্ট হইল না! তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে হরনাথবাবু গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

তৃতীয় দিনে অতিপ্রত্যূষে উঠিয়া হরনাথ-বাবু ডাকঘরে উপস্থিত হইলেন। তখনও ডাকঘর খোলা হয় নাই। ৮টার সময় ডাক বিলি হয়। যথাসময়ে 'পোষ্ট মাষ্টার'-বাবু আফিস গৃহে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই হরনাথবাবু ব্যগ্রভাবে তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়! আমার কোনো চিটী আছে কি?" 'পোষ্ট-মাষ্টার' বাবু হরনাথেরই গ্রামবাসী এবং বিশেষ পরিচিত। তিনি হরনাথবাবুর সকল কথাই জ্ঞাত ছিলেন। কস্মিন্ কালেও হরনাথবাবু ডাকঘরে আসিয়া চিটীর জন্য তাগাদা করেন না। সুধীর কলিকাতায় গিয়াছে, সেইজন্যই যে হরনাথবাবু চিঠির সন্ধানে আসিয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে, আপনার ত কোন চিঠি নেই! বোধ হয়, আপনি সুধীরের খবরের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন! কিন্তু সে ত মোটে পরশু কল্‌কাতায় গেছে, এখনও তার চিটী আসবার সময় হয় নি। হয়ত, কাল আপনার চিঠি আসতে পারে।" হরনাথবাবু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি যে নেহাৎই নির্ব্বোধের মত কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা বুঝিলেন ও লজ্জিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে প্রত্যহ প্রাতে একবার ডাক-ঘরে আসা তাঁহার একটা দৈনিক কার্য্যের মধ্যে দাঁড়াইল।

সুধীর কলিকাতায় পৌঁছিয়া পিতার আদেশে

প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখিত। ইংরাজ-রাজের কৃপায় প্রবাসগত আত্মীয়ের সহিত সংবাদ আদান-প্রদানের ইহা একটি মহা সুযোগ। ডাকঘর তাহাদের পক্ষে মহাতীর্থ-ক্ষেত্র। সন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তি-প্রস্রবণ!

(৬)

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে সুধীরের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সে আজন্ম পিতৃস্নেহে লালিত, পক্ষি-শাবকের ন্যায় পিতার স্নেহময় বক্ষে বর্দ্ধিত! পিতার সে স্নেহনীড় ছাড়িয়া অন্যত্র বাস তাহার পক্ষে যে কষ্টকর হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে জীবনে এক দিনও পিতার অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে অবস্থান করে নাই, প্রবাসে একাকী সে কি প্রকারে স্থির থাকিবে? এখানে ত সে 'কলেজ' হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্নেহময় জনকের দর্শন পায় না! কেহ ত তাহার জন্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে পথ-পানে চাহিয়া থাকে না! পাঠ্য পুস্তকগুলি অযত্নে অবিন্যস্ত ভাবে শয্যার চতুঃপার্শে পতিত থাকে, কেহ সেগুলি যত্ন করিয়া গুছাইয়া রাখে না! পাঠের সময় একখানি পবিত্র আনন আনন্দ-গদ্‌গদ চিত্তে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে না! এ যে আত্মীয়-বন্ধু-বিহীন প্রবাস!—এ যেন পথিকের পান্থ-শালায় অবস্থানের ন্যায় তাঁহার অনুভব হইত। ঘটিকা-যন্ত্রচালিত হইয়া স্নান কর—খাও; কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে আর আহার মিলিবে না। আহার্য্য দ্রব্যই বা কি পরিপাটী! ফেন-মিশ্রিত দাল, খোষা সংযুক্ত কুমড়া-আলুর তরকারি, "জলবৎতরলং" মৎস্যের ঝোল! কোথায় পিতার স্বহস্ত-প্রস্তুত সেই সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন, আর কোথায় এই উড়িষ্যা-দেশবাসী পাচকের কদর্য্য রন্ধন! পল্লী-বালক সুধীরের হঠাৎ এতটা পরিবর্ত্তন নিরুদ্বেগে সহ্য করা কিছু কষ্টকর হইল। কলিকাতা সহরের এ বদ্ধ জলবায়ুও তাহার বড় ভাল লাগিত না। কলিকাতা-বাসিগণ "পাড়া গেঁয়ে" বলিয়া পল্লীবাসীদিগের উদ্দেশ্যে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, কিন্তু পল্লীবাসিগণ প্রকৃতি-রাজ্যের যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পান, সহরবাসিগণের অদৃষ্টে সে সুখভোগ ঘটিয়া উঠে না। নির্ম্মল বাতাস, তটিনীর মধুর কল্লোলধ্বনি, পক্ষীর গান, চন্দ্রের কিরণ, এমন আর কোথায়! কলিকাতা-সহরে এমন কি অনেক গৃহস্থের অদৃষ্টে সূর্য্য-দেবের দর্শনলাভও ঘটিয়া উঠে না। সুধীর প্রকৃতি-রাজ্যের প্রজা। তাই তাহার এ 'ইলেক্ট্রিকে'র আলো, ইলেক্ট্রিকের বাতাস, কলের জল, কিছুই ভাল লাগিত না। তাহার মনঃপ্রাণ সর্ব্বদা সেই মধুমতী-তীরের গৃহকুঞ্জে পড়িয়া থাকিত।

কলিকাতায় আসিয়া সুধীরের একটী সঙ্গী জুটিয়াছিল। অতুল-নামক একটী বালকের সহিত তাহার অত্যন্ত সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। অতুল সুধীরেরই সমবয়স্ক, এবং এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। অতুলের বাটী সুধীরদের মেসের ঠিক্ সম্মুখেই। সুধীর সর্ব্বদাই অতুলের বাটী যাইত। অতুলের মাতাও সুধীরকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। অতুলের ছোট বোন্ বিভা সুধীরকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিত। বালিকার সেই অকপট অনাবিল ভালবাসা সুধীরকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সুধীরের ভ্রাতা-ভগ্নী ছিল

না। ভ্রাতৃপ্রেম ভগ্নীর স্নেহে সে চির-বঞ্চিত ছিল। বালিকা বিভাকে তাই তাহার বড়ই ভাল লাগিত। সরলা বালিকার প্রাণে কুটিলতার স্থান ছিল না। সংসারের ভেদাভেদ-জ্ঞান তাহার জন্মে নাই;—আপন-পর সে জানিত না; শুধু জানিত প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতে। সুধীরকে দেখিলেই সে "সুধীর-দা" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিত, কখনও হাত ধরিয়া টানিয়া মাতার নিকটে লইয়া যাইত। আবার কখনও বা ছোট ভাইটিকে কোলে লইয়া বলিত সুধীর-দা, খোকাকে আমার পিঠে চড়িয়ে দিন্ না; আমি ঘোড়া হব। বালিকার বাসনা শুনিয়া সুধীর "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিত। বাস্তবিক এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হইয়া সুধীরের মন অনেকটা ভাল ছিল। সুধীরের কাছে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে বিভা বড় ভাল বাসিত। সুধীর ও বিভাকে বড় ভাল বাসিত। মধ্যে মধ্যে পুতুলটী, ছবির বইখানি, জরির ফিতা প্রভৃতি কিনিয়া সুধীর বিভাকে প্রীতি উপহার দিত। বিভা তাহা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রত্যেককে দেখাইয়া বেড়াইত। এই-রূপে সুখে দুঃখে সুধীরের প্রবাসের দিন-গুলি এক রকম কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একবার গ্রীষ্মাবকাশ কালে অতুল সুধীরের সঙ্গে সুধীরের বাটী গিয়াছিল। অতুল কলিকাতা-বাসী; জীবনে সে কলিকাতা ভিন্ন অন্য দেশ দর্শন করে নাই। কমলাপুর তাহার নিকটে বড় সুন্দর মনে হইল। ঊষার অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া নব দিবাকর যখন পূর্ব্বাকাশে দেখা দিতেন, তখন নদী-তীরে দাঁড়াইয়া অতুল বিমুগ্ধ নেত্রে তাহা দর্শন করিত। আবার দিবসের কার্য্য সমাধা করিয়া সূর্য্যদেব যখন অস্তাচলে গমন করিতেন, সুধাকর গাছের আড়াল হইতে সহাস্য আস্যে উঁকি দিতেন, এক দিকে কমলিনী বিষণ্ণ চিত্তে আপনাকে সঙ্কুচিত করিত, ও অপর দিকে কুমুদিনী পতি-দর্শন লালসায় সহর্ষ চিত্তে প্রস্ফুটিত হইত, তখন অতুল তাহা দেখিয়া পুলকিত হইত। তটিনীর মৃদু কল্লোল, কোকিলের কূজন, বিহঙ্গের কাকলী, অতুলের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিত। অতুল মনে মনে বলিত, "কে বলে পল্লীগ্রাম খারাপ? আমি যদি এমন গ্রামে বাস করতে পেতুম, তাহলে জীবন স্বার্থক মনে কর্‌তুম! কি পবিত্র শান্তিপূর্ণ এই দেশ! কি সুন্দর! এ যে বঙ্গমাতার বিশ্রাম-কুঞ্জ! জনপূর্ণ নর-কোলাহল-মুখরিত সহর অপেক্ষা এ ক্ষুদ্র পল্লী নির্জ্জন নীরব সাধকের মনোমুগ্ধকর কবিত্বে পরিপূর্ণ!

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

অনুতাপ।

যখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,
সারা নিশি জেগে তোমার আশে,
তখন তুমি এসেছিলে, নাথ,
মালাটীকে ফেলে গেছ পাশে।

ডেকে ডেকে পাও নি তুমি সাড়া,
ফিরে গেছ অভিমান ভরে;
ভেবেছিলে কোনো আয়োজন!
করি নাই আমি তোমা তরে।

ডাক্‌ছি আমি কতদিন ধ'রে,
বঞ্চিত না হব দরশনে!
এমন ক'রে যাবে তুমি চ'লে
ভাবি নাই কোনো দিন মনে!
সযতনে রচি' আসনখানি,
বসেছিলাম, কত আশা ক'রে,
তার উপরে বসবে যবে তুমি,
দেখবো আমি দু'টী নয়ন ভ'রে!

বনে বনে কুড়িয়েছিলাম ফুল,
পূজ্‌বো ব'লে তোমায় কত সাধে।
এসেছিলে যদি, নাথ, তুমি,
জাগালে না কোন্ অপরাধে?
আর আমি ঘুমাবো না কভু,
ফিরে এস ওগো মোর সখা,
একা আমি ভাব্‌ছি বসে ব'সে,
আবার কবে পাব তব দেখা!

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদ।

কংগ্রেসের প্রার্থনা—আগামী জাতীয় মহাসমিতির অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ভারত-সচিব মহাশয়কে বড়দিনের সময় কলিকাতার কংগ্রেস দর্শন করিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভারত-সচিব মহাশয় তাহার উত্তরে জানাইয়াছেন যে, বড়দিনের সময় তাঁহার কলিকাতায় থাকা অসম্ভব।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান মন্দির—সার জগদীশচন্দ্র বসু প্রকৃতির যে রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন, জগতে তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ঐ তত্ত্বের আরও অনুশীলন করিবার জন্য তিনি এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মন্দিরের মধ্যে যেমন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুশীলন হইবে, মন্দিরের পশ্চাতে নির্জ্জন সুরম্যস্থানে সাধক আরও বৈজ্ঞানিক আলোক লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারিবেন। সার জগদীশচন্দ্র স্বোপার্জ্জিত প্রায় ৫ লক্ষ টাকা এই মন্দিরের জন্য প্রদান করিয়াছেন। ১৫ লক্ষ টাকা আবশ্যক। এই সংবাদ অবগত হইয়া, ভারতের জ্ঞান জগতে বিলাইবার অভিলাষে বোম্বায়ের বোনানজী একলক্ষ ও মিঃ মুলজি খাটাও সওয়া দুইলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও ডাক্তার বসুর শিষ্যদিগের জন্য ৬টী বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষায় মহিলা-বৃত্তি।

এ বৎসর নিম্নলিখিত বালিকাগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়াছেন।

২০৲ টাকার বৃত্তি।

সুধা দত্ত—মহারাণী হাইস্কুল দার্জ্জিলিং।

১৫৲ টাকার বৃত্তি।

১। সুবোধবালা রায়—বেথুন।
২। নিখিলবালা গুপ্ত—ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা।
৩। প্রীতিলতা গুহমল্লিক—ব্রাহ্ম গার্লস।
৪। ইন্দুবালা দাসগুপ্ত—ইডেন, ঢাকা।
৫। লীলাবতী নাগ— „ „ ।
৬। সুধা চট্টোপাধ্যায়—বেথুন।

১০৲ টাকার বৃত্তি।

১। অমিয়প্রভা বিশ্বাস—বিদ্যাময়ী, ময়মনসিং।
২। লীলা বসু—ডাওসেসন।
৩। মালতীমালা সরকার, ইউনাইটেড মিশন।
৪। স্নেহপ্রভা সরকার—বিদ্যাময়ী-ময়মনসিংহ
৫। ফুলবালা গুপ্ত—ব্রাহ্ম গার্লস।
৬। সুধীরবালা গুপ্ত— „ „ ।
৭। সুমতিবালা দাস—ইডেন, ঢাকা।
৮। মণিকা চাট্যার্জ্জি—বেথুন।
৯। সুনীতিবালা রায়—বিদ্যাময়ী, ময়মনসিং।

মিঃ টমাসক্লার্ক পিলিং গিবন্স কে, সি, ইংলণ্ড হইতে বাঙ্গালার 'এড্‌ভোকেট জেনারেল'-পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 652. —————— December, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫২ সংখ্যা। } অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। ডিসেম্বর, ১৯১৭। { ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্রদেশ—একতালা।

ঐ মহাসিন্ধুর ও-পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে!
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে, "আয় চলে আয়,
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে!"
বলে, "আয় রে ছুটে, আয় রে ত্বরা,
হেথা নাইকো মৃত্যু, নাইকো জ্বরা,
হেথায় বাতাস গীতি-গন্ধ-ভরা, চির-স্নিগ্ধ মধু-মাসে;
হেথায় চির-শ্যামল বসুন্ধরা, চির-জ্যোৎস্না নীলাকাশে।
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে?
দেখ্ ঐ সুধা-সিন্ধু উছলিছে পূর্ণ-ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চলে আয় আমার পাশে।
কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ,
ওরে ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ?
ওরে, সেই সে পরমানন্দ, যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে আছিস্ পরবাসে!"

কথা ও সুর—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ১
পা -া II { ধা ধা -া। পা -া পমা। মা মা -া। মা মা -া I
ও ই ম হা ০ সি ০ ন্ধুর্ ও পা র থে কে ০

১
[পা -া -া]
সে ০ ০
২ ৩ ০
I মা -পধা পা। -া মগা রসা। রা পা পা। পা পধা -ণা } I
কি ০০ স ০ঙ্গী০ত০ ভে সে আ সে "ও০ ই"

২´ ৩ ০ ১
I { -া -া পা। পা পা -ধণা। ণা ণা -া। র্সা ণা -া I
০ ০ কে ডা কে ০০ ম ধু র তা নে ০

১
[পা মা মমা]
লে আয় ওরে
২´ ৩ ০
I ধা ধা -পধা। পা মা -া। মা -া পা। মা মা -া } I
কা ত র০ প্রা ণে ০ আ য় চ লে আ য়

১
[-া না না]
০ ব লে
২´ ৩ ০
I মা -ধা ধা। ধা ধা -া। ধা ধা -পা। পধা—পা পা II
আ য় চ লে আ য় আ মা র্ পা০ ০ শে

২´ ৩ ০ ১
I { না -া না। না না -র্সা। র্সা -া র্সা। র্সা র্সা র্সর্সা I
আ য় রে ছু টে ০ আ য় রে ত্ব রা হেথা

১
[র্রা র্রা র্সনা]
জ্ব রা হে থা
২´ ৩ ০
I র্সা -র্রা র্সা। ণা -ধা পা। মা -পা র্রা। র্রা র্রা -র্গর্মা } I
না ই কো মৃ ০ ত্যু না ই কো জ্ব রা ০০

২´ ৩ ০ ১
I { না না -া। র্সা -া র্সা। র্সা -র্রা র্সা। ণা ধা -পা I
বা তা স্ গী ০ তি গ -ন্ ধ ভ রা ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা -ধপা। মা -গা রা। রা মা গা। রা রা রা। I
চি র ০০ স্নি ০ গ্ধ ম ধু মা সে হে থা

২´ ৩ ০ ১
I মা মা -পা। পা পা -া। মা পা -র্সা। র্সা র্সা -া I
চি র ০ শ্যা ম ল ব সু ০ ন্ধ রা ০

১
[-া সা সা]
০ কে ন

২´ ৩ ০
I র্সরা -র্সা -ণা। ধা -পা পা। পা ধা -া। পা -ধণা ণা II
চি র ০ জ্যো ৎ স্না নী লা ০ কা ০ ০ শে

২´ ৩ ০ ১
I রা রা -া। রা রা -গমগা। রা রা -া। রা রা রগসা I
ভূ তে র বো ঝা ০ ০ ০ ব হি স্ পি ছে ভূতের

২´ ৩ ০ ১
I মা মা -া। মা মা -া। মা মা -পধা। পা মা মমমা I
বে গা র খে টে ০ ম রি স্ ০ মি ছে দেখ্ ঐ

২´ ৩ ০ ১
I { ধা ধা -া। ধা -া ধা। ধা ণা ধা। পা -া -া I
স্ব ধা ০ সি ০ ন্ধু উ ছ লি ছে ০ ০

১
[ধা র্সা র্সর্সা]
শে ভূ তের

২´ ৩ ০
I পা -ধা পা। মা -া গা। মা ধা পা। ধা ধধা র্সা } I
পূ ০ র্ণ ই ০ ন্দু প র কা শে দেখ্ ঐ

২´ ৩ ০ ১
I র্সা সা -া। র্সর্সা র্সা -া। ণা ণণা -া। ধা ধা -া I
বো ঝা ০ ফে লে ০ ঘ রের্ ০ ছে লে ০

১
[-া না না]
০ কে ন

২´ ৩ ০
I পা ধা পা। মা গা -া। মা ধা -া। পধা -ণা ণা II
আ য় চ লে আ য় আ মা র পা০ ০ শে

২´ ৩ ০ ১
I { না না -া। না না -র্সা। র্সা র্সা -া। র্সা র্সা র্সর্সা I
কা রা ০ গৃ হে ০ আ ছি স্ ব দ্ধ ওরে

১
[র্রা র্রা র্সনা]
অ ন্ধ ওরে

২´ ৩ ০
I র্সর্রা র্সা -ণা। ধা পা -ধপা। মা পা -র্রা। র্রা র্রা -র্গর্সা } I
ও রে ০ মূ ঢ় ০ ০ ও রে ০ অ ন্ধ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I { না না -া। র্সা -া র্সা। র্সর্রা র্সা -ণা। ধা -পা পা I
সে ই ০ সে ০ প র মা ০ ন ০ ন্দ

			১
			[র্রা র্রা র্রা]
			সে কে ন
২´	৩	॰	
I পা পা -ধণা।	ধা পা -মগা।	রা গমা পা।	র্রা -া -া । I
যে আ ॰॰	মা রে ॰॰	ভা ল॰ বা	সে ॰ ॰
২´	৩	॰	১
I মা মা -পা।	পা পা -া।	মা পা -র্সা।	র্সা র্সা -া I
ঘ রে র্	ছে লে ॰	প রে র্	কা ছে ॰
২´	৩	॰	১
I র্সর্রা র্সা -ণা।	ধা পা -া।	পা ধা -া।	পা -ধা ণা II II
প ড়ে ॰	আ ছি স্	প র ॰	বা ॰ সে

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৯)

বাড়ীর দুয়ারের কাছে আসিয়া নমিতা শঙ্কর-চাকরকে ডাকাডাকি করিয়া সাড়া পাইল না। সুরসুন্দর বৃদ্ধকে পথে দাঁড় করাইয়া, বারাণ্ডায় উঠিয়া, সজোরে কড়া নাড়িয়া প্রাণপণে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"বিমল-বাবু, বিমলবাবু!—সুশীলবাবু,— !" এবার সুশীলের সাড়া পাওয়া গেল। তাহারা দুয়ার খুলিয়া দিতে আসিতেছে.....।

সুরসুন্দর বারাণ্ডা হইতে নামিবার উদ্যোগ করিল। সে জুতার ফিতা-টা টানিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে হেট-মুখে বলিল, "তা হ'লে আমি এখন চল্লুম্। কাল সকালে সাড়ে ছ'টায় সমুদ্রপ্রসাদ আস্‌বে। আপ্‌নি নিজে দেখে শুনে, একটু সাবধানে 'ড্রেস্' করিয়ে নেবেন্; ঘা-টায় পুঁজ যেন না হ'তে পায়, লক্ষ্য রাখ্‌বেন্।"

হিতলালবাবুর সৌহার্দ্দ্য ও আপ্যায়নের দৌরাত্ম্যে নমিতার মগজের মধ্যে বেশ একটু উৎকট গোল্‌মাল্ বাঁধিয়া গিয়াছিল। এত-ক্ষণের পর বাড়ীর দুয়ারে পৌঁছিয়া, সে যেন প্রকৃতিস্থ হইবার অবসর পাইল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, প্রসন্ন-সৌজন্যপূর্ণ মুখে ছোট একটি নমস্কার করিয়া বলিল, "আসুন্, আজ আমার জন্যে আপ্‌নারা বড়ই কষ্ট পেয়েছেন, —বিশেষ আপনি......! বাস্তবিক, আমার বড় ভাই এখানে থাক্‌লে, আজকের বিপদে যা' না কর্‌তে পার্‌তেন, আপ্‌নি তা'র চেয়ে বেশী করেছেন।—শুধু দূর থেকে পরের মত নমস্কার করা-টা আজ উচিত হয় না। আপ্‌নাকে প্রণাম করে, পায়ের ধূলো নেওয়া-ই—!"

সহসা পিছু হটিয়া অস্বাভাবিক তীব্র গম্ভীর স্বরে সুরসুন্দর বলিল, "না না, পরকে 'পর'

বলেই মনে রাখ্‌বেন ! ও-সব লৌকিকতার আড়ম্বর—সমস্তই—সব একেবারে ভুলে যান্—ভুলে যান্ ! সংসারের মাঝ্‌খানে দাঁড়িয়ে, শিষ্টসৌজন্য-কোমলতার অনুরোধে, ও-সব হাস্যাস্পদ পাগ্‌লামীকে মনে ঠাঁই দেবেন না ; আমি বারণ করে দিচ্ছি। কে বল্‌তে পারে, শেষে হয় ত একদিন ব্রেক্‌ ঐ জন্যেই ......?" সুরসুন্দর আর বলিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত বাষ্পবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

অন্ধকারে বিস্ময়াহত নমিতার পাণ্ডু বিবর্ণ মুখ-ভাব কেহ দেখিতে পাইল না ; কিন্তু তাহার স্বচ্ছন্দ-নিঃশ্বাস-গতিটা যে, অবরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল ! নমিতা কোন কথা কহিতে পারিল না।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া সুরসুন্দর বেদনা-মথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বড় অশোভন স্পর্দ্ধা-বর্ব্বরতা প্রকাশ কর্‌লুম কি ? কি কোর্ব্বো ! ক্ষমা করুন্ ; উপায় নাই ! আমাদের চক্ষে যে, সৌজন্য, শীলতা, শিষ্টতা, কিছুই নাই ; আছে শুধু, কুৎসা, গ্লানি, আর বীভৎস নীচাশয়তা ! আমাদের আত্মপর কোনো সম্মান-জ্ঞানই নাই ; তাই যথেচ্ছ-কৌতুক-প্রিয়তার পরিচয় দেবার জন্য আমরা অতিব্যগ্র। কিন্তু শ্লীলতার সীমা কোথায়, সেটুকুর হিসাবে আমরা অতিকুণ্ঠিত ! আমাদের মত জানোয়ারের কাছে মানুষের শিষ্টতা জানাতে আসেন্ ? ভুল, বিষম ভুল ! ম্যাডাম্, যে রাস্তার, যে ধূলোর উপর ভগবান্ আপ্‌নাকে দাঁড় করিয়েছেন, সে রাস্তার, সে ধূলোর উপর নারীজনসুলভ হৃদয়ের নমনীয়-কোমলতা নিয়ে দাঁড়াবার স্থান নাই ! প্রাণকে পাথরের মত শক্ত করুন্ ; তবে এখানে দাঁড়াবার শক্তি পাবেন। না হ'লে, ঠক্‌বেন,—বড় মর্ম্মান্তিক ঠকা ঠক্‌বেন্ ! এটা নিশ্চয় !—"

ভিতরের উগ্র-উত্তেজনার তাড়নে সুরসুন্দরের আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না ; ধূলি-ধূসরিত বারাণ্ডার সিঁড়ির উপরে বসিয়া পড়িল ও ঘাড় হেঁট করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগ সবলে দমন করিয়া নিঃশব্দে চক্ষের জল সাম্‌লাইয়া লইল। গভীর অভিমান-বেদনাহত স্বরে সে বলিল, "কোন্ সাহসে মুখ উঁচু করে বিশ্বাস-যোগ্যতার দাবী কোর্‌বো বলুন ! সে স্থান নাই ! চারিদিকে যে বীভৎস পঙ্কিলতার স্রোত বয়ে যাচ্ছে ! এতে কি অধন্য গ্লানিতে মন ভরে যায় না, লজ্জায় ঘৃণায় মুখ পুড়ে যায় না ? আপ্‌নি ছেলেমানুষ ; এ-সবের কি বল্‌বো আপনাকে ? তবে একটি কথা বলে রাখ্‌ছি—।" এই বলিয়া সুরসুন্দর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কঠিন স্বরে বলিল, "আমাদের হৃদয়হীন লঘু চপলতা, নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতার সংস্রব থেকে, যতটা পারেন, দূরে—খুব দূরে সরে দাঁড়ান ! পৃথিবীর বাজারে উচ্চ-প্রাণতা বলে কোন জিনিস নাই ; তাই মানুষের হৃদয়ের নির্ম্মল বিশ্বাস-প্রীতি, শ্রদ্ধা-সম্মান,—এ সকল আমাদের কাছে মূল্যহীন,—নাটক-নবেলের কথা মাত্র ! তাই শ্রদ্ধামর্য্যাদাহীন নীচান্তঃকরণ আমরা। আমাদের অসাধ্য হেয় কাজ পৃথিবীতে কিছুই নাই ! এটা খুব ভাল করে স্মরণ রাখ্‌বেন।

দ্বার খুলিয়া সুশীলের সহিত লছ্‌মীর মা আলো হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। মুখের

ঘাম হেঁট হইয়া হাঁটুর কাপড়ে মুছিয়া, শুষ্ক স্বরে সুরসুন্দর বলিল, "যান্, বাড়ীর ভেতর যান্।" তাহার পর পথে নামিয়া, কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সে আবার বলিল, "কাল সকালেই সমুদ্র আসবে, মনে রাখ্‌বেন।...... তা হ'লে আসি।—যান্, দাঁড়াবেন না; বাড়ী যান্। সুশীল, বাড়ী যাও ভাই!"

সুশীলের সৌজন্য-জ্ঞানটা খুব তীক্ষ্ণ; সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এই যে যাই; আগে আপ্‌নারা চলে যান্; তা'পর।"

সুরসুন্দর শান্ত কোমল দৃষ্টিতে সুশীলের পানে চাহিয়া ম্লানভাবে একটু হাসিল। তার-পর দ্বিরুক্তি না করিয়া, বৃদ্ধের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। নমিতা কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিঃশব্দ পাদক্ষেপে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

সুরসুন্দর দৃষ্টি-পথাতীত হইলে, দুয়ার বন্ধ করিয়া লছ্‌মীর মা'র সহিত সুশীল বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। বিশেষ কার্য্যব্যপদেশে লছ্‌-মা রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। ইহার পর ধীরে সুস্থে নমিতার হাতের সংবাদটা সময় মত জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে বলিয়া, আপাততঃ কাজ কামাই করিতে তাহার স্বরা সহিল না। কর্ম্মঠ-প্রকৃতি লছ্‌মীর মা চির-দিনই হাতের কাজ সারিয়া, তবে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সংবাদ লইত।

সুশীল মা'র ঘরে এক দৌড়ে আসিয়া দিদির সন্ধান লইয়া জানিল, সেখানে দিদি এখনও পৌঁছায় নাই। তৎক্ষণাৎ সে দিদির শয়নকক্ষের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

বিমলের পড়িবার ঘরের ভিতর দিয়া শয়নকক্ষে যাইতে হয়। ছুটিয়া আসিয়া পড়িবার ঘরে ঢুকিয়াই সুশীল হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, টেবিলের কাছে চেয়ারের পিছনে পশ্চাদ্বদ্ধ-হস্তে দাঁড়াইয়া, নমিতা অস্বাভাবিক ব্যাকুল-দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে দেয়ালের গায়ে টাঙ্গান স্বর্গীয় পিতৃদেবের 'ফটো'-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া আছে। তাহার মুখমণ্ডলে নিরুপায়-নির্য্যাতনবাহী শুষ্ক-গাম্ভীর্য্যের দীপ্ত জ্বালা উদ্ভাসিত!

এক রাশ প্রশ্নের বোঝা সুশীলের জিহ্বার মধ্যে জমাট বাঁধিয়া বসিয়া গেল! নমিতাকে ডাকিতে তাহার সাহস হইল না। হাঁ করিয়া খানিক ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইয়া আসিল ও ঝুঁকিয়া পড়িয়া নমিতার 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতটার অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করিতে লাগিল। সন্তর্পণে 'ব্যাণ্ডেজের' এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে অঙ্গুলি-স্পর্শ করিয়া, আপন মনেই সহানুভূতি-করুণকণ্ঠে বলিল,—"আহা!"

সশব্দে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নমিতা মুখ ফিরাইয়া চাহিল। অব্যক্ত গ্লানি-মনস্তাপের উগ্রদ্বন্দ্ব বক্ষের মধ্যে তীব্র আলো-ড়নে চলিতেছিল; তাহারই ঘূর্ণিচক্রে সমস্ত অনুভূতিটা এতক্ষণ যেন হতজ্ঞান হইয়াছিল। সুশীলের আগমন-ব্যাপারটা মোটেই সে টের পায় নাই। একাগ্র-পর্য্যবেক্ষণে রত সুশীলকে নতশিরে পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, সহসা সে চমকাইয়া গেল! আত্মসংবরণ করিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—"কে? সুশীল!"

"হুঁ" বলিয়া, বড় বড় চোখের আগ্রহো-জ্জ্বল দৃষ্টি নমিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া সুশীল বলিল, "আমি ভেবেছিলাম বুঝি, তুমি আগেই মা'র সঙ্গে দেখা করতে গেছ!

কাপড় ছাড়্‌তে এসেছ, তা ত জানি নে! মা যে তোমার জন্যে বড্ডই ভাব্‌ছেন, দিদি!"

তাহার জন্য ভাবনা!—ধ্বক্ করিয়া রূঢ় বেদনার আঘাতে হৃৎপিণ্ডটা সজোরে নমিতার বুকের মধ্যে লাফাইয়া উঠিল। 'মা তাহার জন্য অত্যন্তই ভাবিয়া থাকেন—!' ইহা ত অত্যন্ত পুরাতন কথা! শুনিয়া শুনিয়া তাহার ত ইহা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে! কিন্তু আজ?......না, না, এই পুরাতন অভ্যস্ত সত্যের আস্বাদ আজ অত্যন্ত নূতন! সমস্ত অন্তঃকরণটা আজ নিদারুণ অভিমান-ক্ষোভে অশ্রু-সজল হইয়া উঠিতে চাহিতেছে! তাহার জন্য ভাবনা!' সত্যই তাহার অবস্থা আজকাল অসহনীয় সমস্যা-সঙ্কটে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! তাহার জন্য সকলেই অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তান্বিত! যাহার ভাবিবার কথা নয়, তিনিও!

মুখ ফিরাইয়া নমিতা তীব্রদৃষ্টিতে নিজের দেহের পানে চাহিল! একটা হিংস্র উন্মাদনায় মনটা মুহূর্ত্তে নিষ্ঠুর উগ্র হইয়া উঠিল! এই দেহটার জন্যই না? হাঁ, সকল দিকেই অন্ন-দাসত্বের চরণে আত্মবিক্রয় করিয়া, দেহযাত্রাটা বেশ স্বচ্ছলভাবে সে নির্ব্বাহ করিতেছে, কিন্তু জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে! শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাধীন স্বচ্ছন্দতাও যে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে! সংসারের যত কিছু জঘন্য-লালসার ক্রূরদৃষ্টির সামনে শুধু এইটার অপরাধেই ভয়-কুণ্ঠিত হইয়া চলিতে হয় না? হাঁ, শুধু এই জন্যই! কঠিন হস্তে কণ্ঠনালী টিপিয়া ধরিয়া বিকৃতকণ্ঠে নমিতা বলিল, "বেরিয়ে যা, সুশীল—!"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া সুশীল বলিল, "তুমি কাপড় ছাড়্‌বে?"

অকস্মাৎ উগ্র ঝাঁজের সহিত নমিতা বলিল, "হাঁ, হাঁ; তুই যা না—!"

বিস্মিত সুশীল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। চেয়ারের পিছনে বসিয়া পড়িয়া হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া, আজ অনেক দিনের পর, নমিতা অসহ্য কষ্টে, আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল! তীব্র অভিমানাহত নিঃশব্দ ক্রন্দন!

নমিতা সংসার-জ্ঞানে অনভিজ্ঞা, নির্ব্বোধ, ছেলেমানুষ! হায়, সংসারের মানুষ, বাহিরে দাঁড়াইয়া দেহের বয়স হিসাব করিয়া কাহাকে বিচার করিতে চাহ! দুঃখ-দ্বন্দ্ব-শোকের তাড়া খাইয়া সচেতন অনুভূতি-সম্পন্ন মানুষের মনের বয়স যে অত্যন্ত শীঘ্র বাড়িয়া উঠে! দেহের বয়সের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া সব মাটী মাড়াইয়া চলিবার সাধ্য ত তাহার থাকে না!......কিন্তু হায়, কে ইহা বিশ্বাস করিবে? বিষয়ী বুদ্ধিমানেরা জানেন, ইহা নাট্যাচার্য্যের নাটকীয় বিজ্ঞতা, ঔপন্যাসিকের অলস-মস্তিষ্ক-প্রসূত ভৌতিক উপদ্রব!...... থাক্, যাহা ইচ্ছা তাঁহারা মনে করুন, ইহা লইয়া তর্ক চলিবে না!

*

দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। পিতার আলোক-চিত্রের দিকে চাহিতেই তাহার দৃষ্টি আবার বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া গেল! ঐ পুণ্যোজ্জ্বল শোক-স্মৃতি! উহার প্রতিষ্ঠা-অর্চ্চনার স্থান সত্যই কি জগতে কোথাও নাই? জীবন্ত মানুষের সজাগ প্রাণের অভ্যন্তরেও নাই? ঐ সুমহান্ স্মৃতির তেজস্বী শক্তি-প্রেরণাবলে হৃদয়ের মধ্যে দৃপ্ত নির্ভীক হইয়া, শান্ত-নির্ম্মল দৃষ্টি

তুলিয়া, সে সমস্ত জগতের সকল নয়নে যে, ঐ পিতৃনয়নের উজ্জল স্নেহ-করুণা দেখিতে চায়, ঐ পিতৃমুখের প্রতিবিম্ব-মহিমা দেখিতে চায়। সে সবই অলীক ভাবুকতা মাত্র! সত্যের লেশ তাহাতে কিছুই নাই! অসহ্য! এমন জঘন্য কৃতঘ্নতার—এমন নিষ্ঠুর বিশ্বাসহীনতার বেদনা বহিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না; অন্ততঃ নমিতা পারিবে না।

সহসা একটা নূতন আশ্বাসের সুর আসিয়া তাহার অবসন্ন মনকে স্পর্শ করিল। শান্ত হইয়া নমিতা চক্ষের জল মুছিল। এই সময় বাহির হইতে সুশীল ডাকিল, "দিদি, এখনো তোমার হয় নি?" আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া নমিতা বলিল, "তুই, বুঝি আমার জন্যে এখনো দাঁড়িয়ে আছিস্? আচ্ছা, ঘরে আয়।"

ইতস্ততঃ করিয়া সুশীল বলিল, "না, তুমি কাপড় ছাড়; আমি মা'র কাছেই যাই—।"

নমিতা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "না না, এই খানেই আয় ভাই, একটা কথা বলবো—।

সুশীল ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি —?"

নমিতা আঁচলের কাপড়টা মুখের উপর উস্তমস্তপে ঘসিয়া মাজিয়া, নিকটস্থ চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। সুশীলকে পাশে টানিয়া লইয়া, ডানহাতে তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া স্মিতমুখে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "মিথের কাছে ডাক্তার মিত্রের কথাটা বলা হয়েছে? প্রকাণ্ড বোকা তুই!......আচ্ছা, বল ত, বাড়ীতে মা'র কাছে এসেও সব গল্প করেছিস্?"

ঘাড় নাড়িয়া বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে সুশীল বলিল, "না দিদি, শুনে শুধু মার মনে দুঃখু হবে, তাই বলি নি,...... ।"

উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসটা সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া লইয়া নমিতা বলিল, "লক্ষ্মী ভাইটী আমার! মগজের বুদ্ধির সঙ্গে বিবেচনা একটু খাটিয়ে সাবধান হয়ে মা'র কাছে কথাবার্ত্তা বলো! শোকে-দুঃখে একেই তাঁর মন ভেঙ্গে রয়েছে, তার ওপর বাইরের ব্যাপার,—আমাদের দুঃখ, ক্ষতি অপমান, এ গুলোর ভার আর চাপান চলে না!... বাইরের বোঝা চৌকাটের বাইরে নামিয়ে রেখে, ঘরে তাঁর কাছে হাল্কা হয়ে এসে দাঁড়াতে হবে। বুঝেছ মাণিক, তাঁর কাছে কিছু বলো না...।"

নমিতার বেদনা-করুণ কণ্ঠস্বরে সুশীলের চোখ্-দুইটা ছল্ ছল্ হইয়া আসিল। ম্লান মুখে সে বলিল, "কিন্তু তোমার হাতে ক্রুশ বিঁধে যাওয়ার কথাটা ত বলে ফেলেছি—।"

মৃদু হাসিয়া নমিতা বলিল, "উত্তম, ওটা এড়িয়ে যাওয়া চল্‌ত না।"

সুশীল পুনশ্চ বলিল, "আমারই মাথায় ঠুকে যে তোমার হাতে ক্রুশ বিঁধে গেছে, তাও বলেছি।—তা'র জন্যে ছোড়্দি—।"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সহাস্যমুখে নমিতা বলিল, "থাক্ থাক্, বুঝেছি। ছোড়্দির কথা বাদ দিয়ে যা। চল মা'কে আগে দেখা আসি।"

সুশীল বলিল, "কাপড় ছাড়্‌বে না?"

"তিনি ভাবছেন্ রে, আগে তাঁকে খবরটা দিয়ে আসি—।" এই বলিয়া নমিতা বাহির হইল। সুশীলও তাহার পিছু পিছু চলিল।

বাহির হইতে বিমল আসিয়া সদর দুয়ারের কড়া নাড়িয়া ডাকাডাকি করিতেছে

শুনিয়া, সুশীল দুয়ার খুলিয়া দিতে ছুটিল। নমিতা একাকিনীই মা'র ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মা পিঠের কাছে উঁচু বালিশ রাখিয়া, অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কষ্টে নিঃশ্বাস টানিতেছিলেন। নমিতা ঘরে ঢুকিতেই, উদ্বেগপূর্ণ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে তিনি বলিলেন, "হাতটার কি বড়ই লেগেছে ?"

প্রফুল্ল-স্মিত মুখে বেশ জোরের সহিত নমিতা বলিল, "কিছু না!—সামান্যই আঘাত!—"

সমিতা মাতার বুকে তৈল-মালিশ করিতেছিল। নমিতা তাহারই পাশে বসিয়া পড়িয়া প্রসন্ন মুখে বলিল, 'কাণার নগ্নে কুঁজের বিয়ে';—মাঝ্‌খান থেকে আমি সাতদিনের ছুটি পেয়ে গেলুম।—এ একরকম মন্দ হোল না। যথালাভ.........।" এই বলিয়া নমিতা সকৌতুকে হাসিতে লাগিল; যেন তাহার এই পরমলাভের সুসংবাদটুকু মাতার কাছে বহন করিয়া আনিতে পারায় আনন্দে সে পরম কৃতার্থতায় উল্লসিত!—কিন্তু অন্তর্য্যামী দেখিতেছিলেন, তাহার এই ছুটির লাভ-টা কিন্ত কঠোর-গ্লানি-বিষ-দগ্ধ! কি দুঃসহ-বেদনাময়! কি নিদারুণ অস্বস্তি-অভিশাপপূর্ণ!

স্নিগ্ধের স্নেহ-করুণার উল্লেখে খুব একটা বড় রকম ভূমিকা ফাঁদিয়া, নমিতা জাঁকাইয়া প্রশংসা সুরু করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সুশীলের সহিত বিমলকুমার খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরে ঢুকিল। নমিতার 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতের প্রতি ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিমল ক্ষুব্ধভাবে বলিল—"উঃ, কি গ্রহের ফের! দুঃখ-বিপদ যখন আসে, তখন এমনি করেই এসে থাকে! তোমার দরকারী কাজের হাতটা আজ্ জখম্ হোল!"

বিমল বাম পায়ের গ্রন্থিটা সজোরে টিপিয়া ধরিয়া কাতরভাবে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "অন্ধকারে ছুটোছুটি করে যেতে খানায় পড়ে পা মচ্‌কে গেছে! তবু এই পা নিয়েই চারিদিক্ ঘুরলুম্; কেউ সন্ধান বল্‌তে পার্‌লে না, মা!...বাস্তবিক, লোকটা আশ্চর্য্য পালানই পালিয়েছে!..."

সবিস্ময়ে নমিতা বলিল, "কে ?"

সুশীলের দিকে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিমল বলিল, "গেজেট, কি নিত্যকর্ম-পদ্ধতি ভুলে গেছিস্, না কি? ডাক্তারবাবুর ঠাকুর যে ফেরার...! শোন নি, দিদি ?"

হতবুদ্ধি নমিতা বলিল, "কখন্ ?—"

বিমল বলিল, "সমি ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে তাকে খবর দিয়েছিল যে, ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তুমি দেখা কর্‌তে গেছ। সেই শুনেই সে বেচারী উদ্বেগ-চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। তারপর তুমি গেছ, সুশীল গেছে, আমি 'বল্' খেল্‌তে বেরিয়ে গেছি; ইতিমধ্যে কখন্ সে গায়ের কাপড়খানি নিয়ে সুট্ করে নিঃশব্দে পিটটান দিয়েছে; কেউ জানে না! আমি 'বল্' খেলে এসে ব্যাপার শুনে, তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলুম্; এই বাড়ী ঢুক্‌ছি!"

নমিতা স্তম্ভ হইয়া খানিকক্ষণ ভাবিল। বিমল আহত পায়ের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বিরক্তভাবে বলিল, "যাই বল বাপু, পরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে, সুখস্বস্তি ত ষোল আনা! আবার বদনামের ভাগী হওয়া

দ্যাখো! রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কোথায় হয় ত ভোঁচ্‌কানি লেগে মরে পড়ে থাক্‌বে, তারপর সে পাপের দায়ী কে হ'বে বল ত? আর লোকটার নিমক-হারামি দ্যাখো! আমরা এত যে কর্‌লুম্‌, তা একটা কৃতজ্ঞতা জানান নেই, কিছু নেই;—খাতির নদারত; বেমালুম গা-ঢাকা দিলে! কি বল্‌তে ইচ্ছে হয় বল দেখি?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা বলিল, "কৃতজ্ঞতার কাঙ্গালী হয়ে এখানে বসে মাথা খুঁড়্‌লে কোনই লাভ নেই। উঠে পড়, ভাই! চল দু'জনে মিলে রাস্তায় আর একটু খোঁজ্‌ তল্লাশ করে আসি। আমাদের কর্ত্তব্যটা আমরা পালন করে যাই; তারপর ভগবানের ইচ্ছা—!"

আহত চরণটির পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিমল বলিল, "তুমি বল্‌ছ, চল যাই; কিন্তু কিছুই যে ফল হবে না, তা আগেই বলে রাখ্‌ছি। আর একটা কথা। স্বরস্থন্দর ডেওয়ারীকে বলে এসেছি। তিনি এখনি চারিদিকে লোক পাঠিয়ে সন্ধান নেবেন। ওঁর কাছে উপকার পায় বলে, অনেক হিন্দুস্থানী ওঁর বাধ্য আছে। স্বরস্থন্দর আরো বল্লেন, ঐ ঠাকুরের চাচা না কি হয় বটে, কে এক ভাই বেরাদার কাছারিতে পেয়াদার কাজ করে। তা'র কাছে খোঁজ্‌ নিলে, খুব সম্ভব, সন্ধান পাওয়া যাবে।"

রুষ্টভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নমিতা বলিল, "তোর সবই ব্যাগার-ঠেলা কাজ! এখন থেকে এই রকম ফাঁকিবাজ্‌ হ'তে অভ্যাস কর্‌ছিস্‌, এর পর বয়স বাড়্‌লে সংসারের কাজে একটা অদ্ভুত স্বার্থপর জন্তু হয়ে উঠ্‌বি, দেখ্‌ছি!"

নমিতা যে হঠাৎ এমন রাগিয়া উঠিবে, বিমল তাহা প্রত্যাশা করে নাই। একটু থতমত খাইয়া সে বলিল, "তেওয়ারী নিজেই খোঁজ্‌ নেওয়ার কথা তুল্লেন। হাঁস্‌পাতালের বুড়ো মেথরকে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মোড়ের কাছে দেখা হল; আমায় খোঁড়াতে দেখে তিনি বল্লেন, "আপ্‌নি আর কষ্ট কর্‌বেন না; বাড়ী যান্‌! আমি খবর নিয়ে পরে আপ্‌নাকে জানাব।" তাঁ'রই কাছে ত তোমার হাতে ক্রুশ বিঁধে যাওয়ার খবর পেলুম!"

নমিতা কোনও উত্তর দিল না। মনের মধ্যে যে অত্যুগ্র দ্বন্দ্ব-তিরস্কারের বিশৃঙ্খল তুফান-স্রোত বহিতেছিল, তাহার উদ্দাম ঢেউ সশব্দে তাহার উপরে আছ্‌ড়াইয়া পড়িতে চায় দেখিয়া, নমিতা নিজের উপর বিরক্ত হইল। পাচকের পলায়ন-সংবাদের নীচে সব দুশ্চিন্তা ঢাকা পড়িয়াছিল। একটা উদ্বেগ-পীড়ন উপর্য্যুপরি ঝাপ্টা হানিয়া তাহাকে অশান্ত করিয়া তুলিতেছিল। পাচকের সাহায্যের জন্য ডাক্তার-পত্নী তাহাকে টাকা গতাইয়া দিয়াছেন;—সে-কথা মা'র কাছে বলা উচিত কি না?—সে-সমস্যা লইয়া নমিতা নিজের মধ্যেই অত্যন্ত বিপন্নতা অনুভব করিতেছিল। মা হয় ত ভিতরের দিক্‌টা তলাইয়া বুঝিবেন না, বিরুদ্ধ ধারণায় অসম্মান-বোধে, বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইবেন। কিন্তু ডাক্তার-পত্নীর সেই বেদনা-করুণ মুখচ্ছবি মনে পড়িলে, নমিতার মনের আত্মসম্মান-বোধটা যে নম্র অভিভূত হইয়া আসিতে চাহিতেছে, স্নেহ-সমবেদনায় প্রাণটা আর্দ্র হইতে চাহিতেছে! আহা, সেই নিরুপায় মর্ম্মপীড়িতা বেচারীর অনুতপ্ত হৃদয়-

ভার-লাঘবে সাহায্য করিতে পারিলে, নিজের সম্মান-ক্ষুণ্ণতার দুঃখ ভুলিয়াও নমিতা সত্যই সুখী হইতে পারিত। কিন্তু এ যে সকল দিকে গোল বাধিল! হায়! নমিতা গৃহে ফিরিবার আধ্ ঘণ্টা পরে যদি পাচকের মাথায় পলায়নের সুবুদ্ধিটার উদয় হইত!

বিমলের কাছে আসিয়া আহত পায়ের এ-দিক্ ও-দিক্ টিপিয়া দেখিতে দেখিতে নমিতা বলিল, "মচ্‌কে ফুলে গেছে! একটু চূণে-হলুদ্ গরম কর্‌তে হবে—।"

আশ্বস্ত হইয়া বিমল তাড়াতাড়ি সমিতার দিকে চাহিল। বিমলের অভিপ্রায় বুঝিয়া মাতা বলিলেন, "সমি, যা মা, চূণে-হলুদের ব্যবস্থা দ্যাখ্। মালিশ থাক্—।"

সজোরে মালিশ করিতে করিতে ঘাড় নাড়িয়া আপত্তির সুরে সমিতা বলিল, "এই এখুনি! দেখ্‌ছ এখন তেল মালিশ কর্‌ছি—"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "তাই ত। না না, মালিশ চলুক্। আমি ওর পায়ের সদগতি কর্‌ছি; তুই মালিশ্‌টাই ততক্ষণ কর্। আমি এসে তোকে ছুটি দেব—।"

পরম সন্তোষে কৃতজ্ঞ ও উৎফুল্ল হইয়া সমিতা বলিল, "হ্যাঁ দিদি, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী তোমায় কেন ডেকেছিলেন?"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নমিতা বলিল, "'টাই'য়ের নমুনার জন্যে। কাল বোনার বাক্সটা একবার পাড়্‌তে হবে। হাঁ, ভাল কথা! মা, আমাদের ডাক্তারবাবুর স্ত্রী অক্ষয় সেনের পিস্‌তুতো বোন্। সেই অক্ষয়-দা—দাদার বন্ধু—।"

প্রবাসী 'দাদা'র সম্পর্কীয় প্রত্যেক সংবাদের প্রত্যেক বর্ণটির জন্য ভাই-বোনের চক্ষুকর্ণ সজাগ হইয়া থাকিত। সুতরাং তৎক্ষণাৎ অনেকগুলা আগ্রহ-ব্যস্ত প্রশ্ন উপর্য্যুপরি বর্ষিত হইয়া গেল। যথাসম্ভব সংক্ষেপে সে-গুলার সন্তোষজনক উত্তর দিয়া নমিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অতীত-সৌভাগ্য-দিনের অনেকগুলা বিস্মৃতপ্রায় স্নেহ-মধুর স্মৃতি সকলের মনের মধ্যে জাগিয়া একটা করুণ বেদনালোকের সৃষ্টি করিল।

আবশ্যক খুচ্‌রা কাজকর্ম্ম সব সারিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে নমিতা হাঁস্‌পাতালের দরখাস্ত লিখিল। তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাকথা ভাবিয়া অনিলকে একখানি পত্র লিখিল।

পাছে অনিল দূরদেশে থাকিয়া বেশী দুশ্চিন্তায় পড়ে বা দুঃখিত হয় বলিয়া, নমিতা পারিবারিক ঘটনার বহিভূর্ত সমস্ত সংবাদ যথাসম্ভব কাট্‌ছাঁট্ করিয়া তাহাকে জানাইত। অনিলও দূরে থাকিয়া একমাত্র স্বিথের প্রশংসা ছাড়া আর কাহারও সংবাদ পাইত না। আজ নমিতা তাহাকে হাঁস্‌পাতাল-সংক্রান্ত সকল কথাই খুলিয়া লিখিল; আর ইহাও লিখিল যে, এরূপ সব উদ্ধতচেতা খাম-খেয়ালী প্রভুর মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে হইলে, ক্রমে নিজের ন্যায়ান্যায়-বোধ ও মনুষ্যত্ব-জ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিয়া চলা ভিন্ন গতি নাই। কাজেই এখানে বেশি দিন টিকিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা সকলের উপর। কিন্তু মানুষকেও ঈশ্বর চেষ্টা ও চিন্তা করিবার শক্তি দিয়াছেন; সুতরাং কুম্ভকর্ণের নিশ্চিন্ত-নিদ্রা-অবলম্বনে উদাসীন থাকা অনুচিত বিবেচনায় নমিতা অন্যত্র চেষ্টা দেখিতেছে। এখন অনিলের অনুমতি প্রার্থনীয়।

নমিতা হিসাব করিয়া দেখিল এই পত্র অনিলের হাতে গিয়া পৌছিবার ঠিক্ সাতদিন পূর্ব্বে তাহার চরম পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে। উদ্বেগে দুর্ভাবনায় সারা রাত্রি আর সে ঘুমাইতে পারিল না; থাকিয়া থাকিয়া একটা রুক্ষ ঔদ্ধত্য তাহার মনের মধ্যে অপমানের ঝঞ্জনা হানিতে লাগিল! নির্ম্মম দাসত্ব-সম্মান। অতিনির্ম্মম! এক-একবার পাচকের কথা মনে হইতে লাগিল। যদি কেহ তাহার কোনও সংবাদ আনে, তাই উৎকর্ণ হইয়া সে পথের দিকে কান পাতিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার অন্ধ চিন্তায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল।

সারা রাত্রি কাটিল। পরদিন বেলা বারটার সময় সুরস্থন্দর হাসপাতাল হইতে জনৈক কুলির হাতে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া পাঠাইল, "বিমলবাবু, বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইলাম, পাচক তাহার ঔষধের শিশি ও গায়ের কাপড় লইয়া একজন পরিচিত লোকের সহিত, কাল সন্ধ্যা সাতটার ট্রেনে তাহার দেশের দিকে গিয়াছে। খুব সম্ভব সে নিরাপদেই দেশে গিয়া পৌছাইবে। এখন হৈ চৈ করিয়া লাভ নাই। ব্যাপারটা চাপিয়া যাওয়াই সকলের পক্ষে মঙ্গল।"

নমিতা নূতন ভাবনায় পড়িল। টাকাগুলি কেমন করিয়া সকলের অগোচরে ডাক্তার-বাবুর স্ত্রীর কাছে পৌছাইয়া দেওয়া যায়?

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গান।

(মূলতান)

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর
হৃদয় উদাসে!
কোথা তুমি প্রিয়তম,
পরাণ উচ্ছাসে!

তোমায় আজি পেলে প্রাণে,
ভরাই হৃদয় গানে গানে,
জীবন-ভরা অশ্রু আমার
মুছাই নিমেষে!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তারকেশ্বর।

তারকেশ্বর হুগ্‌লি-জেলার অন্তঃপাতী শ্রীরামপুর 'সব-ডিভিসনে'র একটি গ্রামমাত্র। ইহা শিবের জন্যই বিখ্যাত। ষ্টেশন হইতে মন্দিরটি প্রায় ৫০০ গজ দূরে অবস্থিত। সকল দিনেই দেবদর্শনার্থ লোকে এখানে সমাগত হয়; তবে সোমবারই অতিপ্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এখানে

আসিবার জন্ত বৎসরের কোনও কাল নির্দ্দিষ্ট নাই। সকল ঋতুতে এবং সকল দিনেই এখানে আসিবার নিয়ম আছে। মহাদেবের পূজার জন্ত জমীদারি আছে। তাহার উপস্বত্ব হইতে দেবপূজা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দেবদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিদিগের পূজা হইতেও মন্দিরের বিলক্ষণ আয় হইয়া থাকে। মহান্ত শিবের পূজার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যাহা কিছু আয় হয়, সারাজীবন তিনিই তাহার ভোগ করেন। তারকেশ্বরে দুইটি মেলা হইয়া থাকে:—প্রথমটি শিবরাত্রের সময়; এবং দ্বিতীয়টি চৈত্রমাসের সংক্রান্তির সময়। শিব-রাত্রে অন্যূন বিশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই সময় লোকেরা নির্জ্জল উপবাস ও রাত্রিজাগরণ করিয়া শিবপূজা করে। শিবরাত্রের মেলাটি তিন দিন থাকে। দ্বিতীয় মেলাটি চড়ক-পূজায় হয়। চৈত্রমাস ব্যাপিয়া শূদ্রসন্ন্যাসিগণ দিবাভাগে উপবাস করেন ও সূর্য্যাস্তে ভোজন করেন। চড়ক-সঙ্ক্রান্তির দিন তাঁহারা তারকেশ্বরে সমাগত হইয়া গৈরিক উত্তরীয় মোচনপূর্ব্বক শিবপূজা করেন। অধুনা চড়কোৎসব পূর্ব্বকালের ন্যায় ভয়াবহ নহে। পূর্ব্বে সন্ন্যাসিগণ স্বীয় চর্ম্মভেদ করিয়া ঘূর্ণি খাইতেন, তাহাতে তাঁহাদিগের কষ্ট যৎপরোনাস্তি হইত। এখন তাঁহারা কোমরে পেটি পরিয়া সেই পেটির সহিত চড়কগাছের আংটা লাগাইয়া ল'ন। এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের কষ্টও হয় না এবং ঘূর্ণি খাইতে অনেক সুবিধা হয়।

তারকেশ্বরের মহাদেব-সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, অযোধ্যার অন্তঃপাতী মহো-বাগোরকালিক-নামক স্থানের বিষ্ণুদাস-নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা মুসলমানদিগের অধীনে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া সহচর-সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে আগমনপূর্ব্বক হরিপাল-নগরের সন্নিকটস্থ বলাগোড়ের রামনগর-নামক গ্রামে উপস্থিত হ'ন্। তাঁহার সহিত পাঁচশত অনুচর ছিল। এতদ্ব্যতীত একশতজন কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণও তাঁহার সহিত ছিলেন। নবাগত-ব্যক্তিদিগের বিচিত্র বেশ, বিচিত্র কেশ, বিচিত্র শ্মশ্রু প্রভৃতি ও তাহাদিগকে শস্ত্রপাণি দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা তাহা-দিগকে দস্যু বিবেচনা করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট তাহাদিগের আগমনবার্ত্তা প্রেরণ করে। ফলে নবাব-কর্ত্তৃক রাজা আহূত হ'ন্। তখন রাজা স্বয়ং নবাবের সহিত সাক্ষাৎকারে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া থাকিবার জন্ত আশ্রয় প্রার্থনা করেন। নবাব রাজার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ চাহিলে রাজা উত্তপ্ত লৌহশলাকা হস্তে ধারণ করেন এবং তাঁহার কোনও দুরভিসন্ধি না থাকাতে তিনি অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলেন না। তদ্দর্শনে নবাব তাঁহাকে ৫০০ বিঘা জমি থাকিবার জন্ত দান করেন। এই জমীগুলি তারকেশ্বরের চারি মাইল দূরে অবস্থিত।

রাজা বিষ্ণুদাসের বরমলসিংহ-নামক জনৈক ভ্রাতা ছিলেন। ইনি সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তারকেশ্বরের জঙ্গলে তাঁহার অবস্থিতি-কালে একদা তিনি দেখিলেন যে, অনেকগুলি পয়স্বিনী গাভী দুগ্ধভারে মন্দ-গতি হইয়া বনে প্রবেশ করিল কিন্তু বন হইতে প্রত্যাগমনকালে তাহারা দুগ্ধভার-বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছে। তখন তাঁহার মনে

কৌতূহল জন্মিল যে, কে এই গাভীগুলিকে দোহন করিয়াছে? অনুসন্ধানেচ্ছু হইয়া তিনি একদিন গাভীদিগের সহিত বনে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু যাহা তিনি দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি দেখিলেন, গাভীগুলি একখণ্ড প্রস্তরের উপরে পর্য্যায়ক্রমে যাইয়া দণ্ডায়মান হইতেছে ও তাহাদিগের স্তন হইতে দুগ্ধধারা স্বতঃই নিঃসৃত হইয়া প্রস্তরোপরি পতিত হইতেছে। নিকটে সমাগত হইয়া আরও দেখিলেন যে, প্রস্তরটিতে রাখালগণ ধান কুটিয়া খাওয়াতে তথায় একটি গহ্বর হইয়া গিয়াছে; সেই গহ্বরেই দুগ্ধধারা পতিত হইতেছে। রাত্রে তারকেশ্বর মহাদেবের আকৃতিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "প্রস্তরটি স্থানান্তরিত না করিয়া তদুপরি তুমি একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দাও। তুমিই সেই মন্দিরের প্রথম মোহান্ত হইবে।" বরমলসিংহ স্বীয় ভ্রাতাকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত অবগত করাইলে উভয় ভ্রাতা মিলিত হইয়া একটি মন্দির নির্ম্মিত করেন। দেবাদেশানুসারে বরমলসিংহ তাহার প্রথম মোহান্ত হ'ন। কালে মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া যায়। বর্ত্তমান মন্দিরটি বর্দ্ধমানের মহারাজ নির্ম্মাণ করান। হাবড়া-নিবাসী চিন্তামণি দে মন্দিরের সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তরের একটি দালান প্রস্তুত করাইয়া দেন। চিন্তামণিবাবু অসাধ্য রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি এই মানস করেন যে, যদি তিনি রোগমুক্ত হ'ন তবে একটি দালান তৈয়ার করিয়া দিবেন। রোগমুক্ত হইলে তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ স্বীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। অসাধ্য-ব্যাধিগ্রস্ত হইলে লোকে তারকেশ্বরে আসিয়া হত্যা দেয়। স্বপ্নে যেরূপ আদেশ হয় তদ্রূপ করিলে লোকে রোগমুক্ত হইয়া থাকে।

মোহান্তকে অবিবাহিত থাকিতে হয়। ইনি দশনামি-সন্ন্যাসিদলভুক্ত।

খড়দহ—(খড়্দা)।

খড়দহ বঙ্গদেশের ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারাকপুর 'সবডিভিসনে'র একটি গ্রামমাত্র। ইহা হুগ্‌লি-নদীর উপর অবস্থিত। এখান-কার লোকসংখ্যা ১৭৭৭ জন। স্থানটী বৈষ্ণব-দিগের তীর্থস্থান। চৈতন্য-মহাপ্রভুর চেলা নিত্যানন্দ এইস্থানে বাস করিতেন। এতদ্ধেতু ইহা বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত প্রিয়। প্রবাদ এইরূপ যে, নিত্যানন্দ এস্থানে সন্ন্যাসিবেশে সমাগত হইয়া হুগ্‌লি-নদীতটে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন হঠাৎ তিনি একটী রমণীর অরুন্তুদ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কৌতু-হলপরতন্ত্র হইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক রমণীকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে রমণী বলিল যে, তাহার একমাত্র প্রাণসমা কন্যা বিগতজীবন হইয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, কন্যাটী মরে নাই; নিদ্রা যাইতেছে। এ কথায় রমণীর কিন্তু প্রতীতি জন্মিল না। রমণী বলিলেন, যদি তিনি কন্যাকে সঞ্জীবিতা করিতে পারেন, তবে রমণী তাঁহার দাসী হইবেন। সন্ন্যাসী-ঠাকুরের অমত ছিল না। তিনি একে সন্ন্যাসী; তাহার উপর অকৃতদার! সুতরাং, এরূপ মাহেন্দ্রযোগ পরিত্যাগ করা অনুচিত বোধে তিনি কন্যাটীকে সঞ্জীবিতা করিয়া রমণীটাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। এখন সংসারে সন্ন্যাসী-ঠাকুর একা নহেন যে, যথাতথা

থাকিবেন। এখন তাঁহার একটী বাটীর আবশ্যকতা। জমীদারকে না ধরিলে স্থান পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া, তিনি জমিদারের নিকট গমন করিয়া স্থান প্রার্থনা করিলে, জমিদার দহে (নদীতে) একগাছা খড় নিক্ষেপ করিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর! তোমার থাকিবার স্থান ঐখানে। নিত্যানন্দ প্রভাবশালী ব্যক্তি; তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই দহের জল তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া গেল এবং তাঁহার থাকিবার উপযুক্ত একটু স্থান বাহির হইল। এইজন্যই গ্রামটি খড়দহ-নামে খ্যাত।

নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র হইতে খড়দহের গোঁসাই-বংশের উৎপত্তি। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। দোলযাত্রা ও রাসের সময় খড়দহে মেলা হইয়া থাকে। এখানে শ্যামসুন্দরের মন্দির আছে।

তিনশত বৎসরের অধিক হইল রুদ্র-নামে জনৈক হিন্দুযোগী শ্রীরামপুরের নিকটস্থ বল্লভপুরে আসিয়া বসতি করেন। স্বপ্নে রাধাবল্লভ তাঁহাকে দেখা দেন ও গৌড়ে যাইয়া রাজধানীর দরজার উপরিস্থ প্রস্তর আনয়ন করিয়া দেবমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। রুদ্র গৌড়ে মুসলমান রাজপ্রতিনিধির মন্ত্রীর নিকট যাইয়া দেবাদেশ জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রি-মহাশয় হিন্দু ছিলেন। দেবাদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি প্রস্তরটিকে দেখিতে আসেন। এমন সময় দেখা গেল যে, প্রস্তর হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতেছে। তখন উপায় উদ্ভাবন করিতে আর বিলম্ব হইল না। তিনি অবিলম্বে স্বীয় মনিবকে তথায় আনাইয়া দেখাইলেন যে, প্রস্তরটী ক্রন্দন করিতেছে। এরূপ অপয়া প্রস্তর রাজবাটীতে রাখিতে নাই; সুতরাং, প্রস্তরটী দূর করা আবশ্যক। মুসলমান মনিব তৎক্ষণাৎ প্রস্তটী অপসৃত করিতে আদেশ দিলেন। রুদ্র তখন প্রস্তরটীকে নৌকার উপর আনয়ন করিলেন। কিন্তু তাহা এত বৃহৎ যে নৌকায় তাহার স্থান হইল না। মাঝিরা নৌকা হইতে প্রস্তরটীকে জলে ফেলিয়া দিল। দৈবকৃপায় সেই প্রস্তর ভাসিতে ভাসিতে বল্লভপুরে পহুছিল। তখন সেই প্রস্তর হইতে তিনটী মূর্ত্তি নির্ম্মিত করা হয়। যথা, বল্লভ, শ্যামসুন্দর ও নন্দদুলাল।

নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র একটি মূর্ত্তি লইতে বাসনা প্রকটিত করেন কিন্তু রুদ্র তাহাতে সম্মত নহেন। একদিন রুদ্র পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিলেন এরূপ সময় বীরভদ্র নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রাদ্ধসময়ে বৃষ্টি আসিয়া পিতৃকৃত্যে বাধা দিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বীরভদ্র তখন করযোড়ে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। দৈবশক্তিতে তথায় বৃষ্টি পতিত হইল না; কিন্তু তাহার চতুঃপার্শ্বে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। রুদ্র ব্যাপার-দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং বীরভদ্রকে একজন অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। সময় বুঝিয়া বীরভদ্র একটি মূর্ত্তি প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রও আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি দান করেন। এই মূর্ত্তিটী এখন খড়দহে আছে। রাধাবল্লভের মূর্ত্তিটী বল্লভপুরে এবং নন্দদুলালের মূর্ত্তি সাহিবানা-নামক গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামটী ব্যারাকপুর হইতে তিন মাইল দূরে